

আবুগি নগর

পঞ্চম সংখ্যা
২০১৫

বাউল ফকির উৎসবের পত্রিকা



সহজ ধারা সঙ্গ কর

আরশিনগর

পঞ্চম সংখ্যা

আরশিনগর
পঞ্চম সংখ্যা
জানুয়ারি, ২০১৫

সম্পাদনা : মৌসুমী ভৌমিক
সহ সম্পাদক : সাত্যকি ব্যানার্জি
সম্পাদকীয় টিম : স্রোতা, আনন্দ, শিল্পী, সাধু
প্রচ্ছদ : অমিত রায়

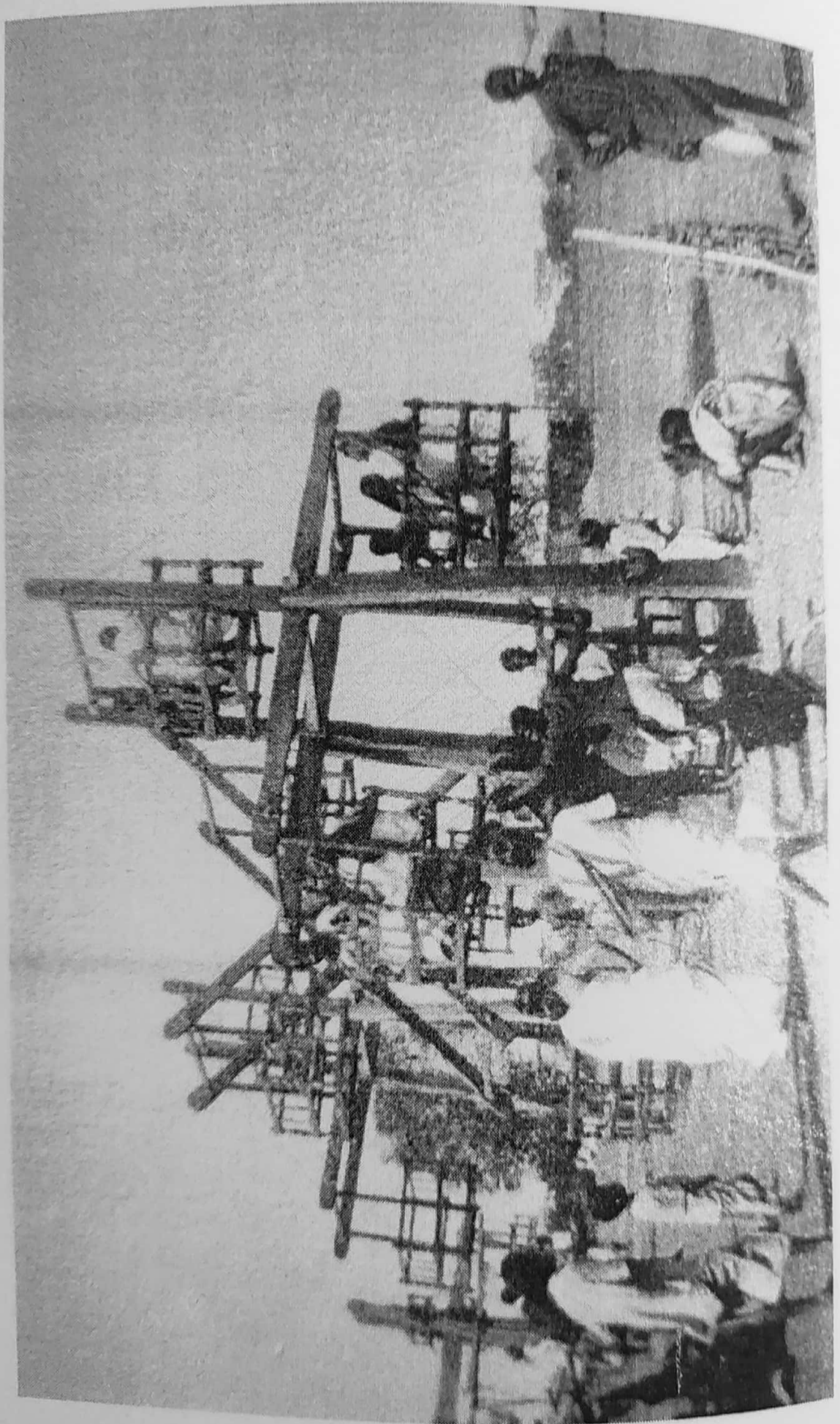
© বাউল-ফকির উৎসব কমিটি

প্রকাশক : বাউল ফকির উৎসব কমিটি
প্রচ্ছদ : অমিত রায়
অঙ্করবিন্যাস : সাইনোস্যুর
মুদ্রক : ইমপ্রিন্ট

বিনিময় : ২০০ টাকা

শুধু কবিগানই নয়, যাত্রাগান, মেলা—এ সবই নিতাইয়ের ভাল লাগে।
আহা, আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা
তাহার কাটিয়া যায়, তবে বড় ভাল হয়।

—কবি, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯৪৪)



মোলা। ছবি: আর্নল্ড বাকে, আনুমানিক ১৯৩২।

সূচীপত্র

আমাদের কথা		১
ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মেলা—রচনার ধারা ও পদ্ধতির পুনর্বিচার		
প্রিয়াঙ্কা বসু		১০
আমাদের মেলা		
জড়িয়ে গেছি মনেপ্রাণে	বিকাশ সরকার	২০
কমিটির ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে	পারমিতা ভট্টাচার্য	২৭
মুখছবি	অমিত রায়	৩০
বাউল ফকির উৎসব: ক্ষেত্র ও পরিসর		
	মানস আচার্য্য	৩৫
সাউন্ডম্যানের বাউল মেলা	সুকান্ত মজুমদার	৪৩
যোগ-শূন্য যোগ: A Festive Union of Separations		
	সাত্যকি ব্যানার্জি	৫১
বড় হলাম এই মেলায়		
মিতির মন		৬২
বিরসার কথা		৬৪
তিতলির কথা		৬৯
ছন্দকের কথা		৭২
ভুতুর গ্রাফিটি		৭৪
মেলা আমাদেরও		
Among the Men of Heart	Abeer Chakravarty	৭৬
দশ বছর ধরে সহজে বাউল-ফকিরের সঙ্গে লাভ		
	শুভব্রত সেন	৭৮
Sketches of Baul Fakir Utsav		
	Diptanshu Roy	৮১
Magic's Soul in Music's Dress		
	Rimi B. Chatterjee	৮৪
স্কেচ	করিশমা	৮৮

অন্য মেলা

An Annual Pilgrimage of Another Kind

Gurpal Singh

৯৩

আরও একটা উৎসবের কথা

পারফর্মার্স ইন্ডিপেন্ডেন্ট

৯৯

From Thailand to Bengal and Back

Robert Millis

১০৩

কান তৈরী করুন ভাই

সৌম্য চক্রবর্তী

১১৪

সাক্ষাৎকার

গান গাওয়াটা আমার নিজস্ব প্রার্থনার মতো

পার্বতী বাউলের সঙ্গে কথোপকথনে ঈশ্বিতা হালদার

১২০

গুরুজী জহাঁ ব্যায়ঠুঁ ওয়হাঁ ছায়াঁ জী

আমিকে খোঁজা

গৌতম ভদ্র

১৩১

মহাজন-প্রণাম

শ্রোতা দত্ত

১৩৯

নানা দেশী গায়ক গাহেন নানা গীত ।
নদীয়া বিহার যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥
চতুর্দিকে নানা বাদ্য বায়েন বাদক ।
নানা দেশ রীতে নাচে যতেক নর্তক ॥
কহিতে কি জানি সুখ সিদ্ধি উথলয়ে ।
যে জানে যে বিদ্যা তা কৌতুকে প্রকাশয়ে ॥

—ভক্তিরত্নাকর, নরহরি চক্রবর্তী (১৬৯৮-১৭৬০) বিরচিত ।
হিতেশ্বরজ্ঞান সান্যালের বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস (১৯৮৯)
গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ২১৮।

গায়ক বাদক ও শ্রোতা সকলেই ভক্তজন । গানের প্রভাবে তাঁহাদের মনে
অষ্টসাত্ত্বিকভাবের উদয় হইতে পারে, অর্থাৎ অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলক,
বৈবর্ণ, স্তম্ভ, স্বরভঙ্গ ও মূর্ছা ঘটান সম্ভব । ইহাই ভাব অর্থাৎ কি না আবেশ
ও বিহ্বলতা । আনন্দে পুলকিত হইয়া কেহ কাঁদিতেছে, কাহারও দেহে
মুগ্ধমূহু রোমাঞ্চ হইতেছে, কাহারও শরীর কাঁপিতেছে আবার কেহ
মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে কীর্তনের আসরে এইরূপ দৃশ্য স্বাভাবিক ।...

—হিতেশ্বরজ্ঞান সান্যাল, বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস (১৯৮৯), পৃ. ১৯৪ ।

ভারতের মধ্যে নবদ্বীপের রাসমেলা, জয়দেবের মেলা, ঘোষপাড়ার মেলা, দৈই দে বৈরাগীতলার মেলা, শান্তিনিকেতন মেলা ও সোণামুখী সাধুর মেলা,—আমার ঠাকুরদাদার দেওয়া একতারা নিয়ে এইসব আসরের শ্রোতা হতে পেরে আমি আমার জীবন ধন্য মনে করি।

১৩৬০ সালে জয়দেবের মেলায় গিয়ে দেখলাম, বহু জায়গায় সাধুরা—সাধুদের থাকার ও সেবার ব্যবস্থা করেছেন। কদমখণ্ডীর আশ্রম, কাঙাল ক্ষ্যাপার আশ্রম, খোটোর বাবার আশ্রম, মনমোহন গোস্বামীর আশ্রম, শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রম, তমালতলার আশ্রম, ও আরো অনেক আশ্রমে—সন্ধ্যা থেকেই বিভিন্ন আসর শুরু হয়।

শ্রীশ্রী নাম সংকীর্তন, রামায়ণ কীর্তন, ভক্তি সংগীত ও বাউল সংগীত... রাত্রি দুটোর সময় মনোহর ক্ষ্যাপার আশ্রমে, বেদনাশ বটতলায়, কিছু প্রবীণ বাউলের আসর চলছে। ক্ষ্যাপা বাবা নিজেই আসর পরিচালনা করছেন। এই আসরে সর্বশ্রী নিতাই ক্ষ্যাপা, ত্রিভঙ্গ ক্ষ্যাপা, বৃন্দাবন দাস, নবনী দাস, সৃষ্টিধর মোহন্ত, ও পঞ্চগনন মুখার্জি, আছেন কিছু সাধুগুরু কিছু সমঝদার শ্রোতা।... গান হচ্ছে প্রতিযোগিতামূলক। দেহতত্ত্ব গানের ভাব নিয়ে প্রশ্নোত্তর। যিনি এই প্রশ্নোত্তর গান ঠিকমতো না গাইতে পারছেন, তাঁকে সাধুরা তো বটেই, দর্শকরাও তাঁর গান বন্ধ করতে বলছেন।...

জয়দেবের মেলায়, তিনদিনব্যাপী সাধু বৈষ্ণবের সেবা ও নাম সংকীর্তন চলে। পৌষ মাসের সংক্রান্তি হতে ২ মাঘ পর্যন্ত এই মেলা চলে। এই মেলায় শেষ রাত্রি দুটোর সময়, ঘুরতে ঘুরতে এক গাছতলায় দেখি, একজন বাউল শিল্পী বসে আছেন ও তাঁর কাছে কতক জন বাউল প্রেমিক তাঁর গান শুনছেন। দেখে আমি সেখানে গেলাম। তখনকার সময় এত আলোর রোসনাই ছিল না। দু-একটা হাজার লাইট শুধু দেখতে পাওয়া যেত। মাইক ছিল না। তার কারণ মাইক ও তার ব্যাটারি বহু দূর-দূরান্ত থেকে মাথায় করে আনতে হত। দুর্গাপুর থেকে হেঁটে যাওয়া বা গরুর গাড়িতে লোক যেত, বিশেষত সাধু-সন্তরা হেঁটেই যেতেন।

সেবা নেওয়ার জন্য যাঁরা আসতেন মনে হয় তাঁরাই শুধু দু-চারখানা গরুর গাড়ি ব্যবহার করতেন। অধিকাংশ আশ্রমে হ্যারিকেন জ্বলতে দেখা যেত। বাউল শিল্পী গান গাইছেন, মাঝে মাঝে প্রেমিকরা চা, গাঁজা খাওয়াচ্ছেন ও কিছু প্রশ্ন রাখছেন। আমার দেখে খুব ভাল লাগল। আমি মনযোগ দিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদান করলাম। দেখলাম বাউল বাবা চা ও তামাক খেয়ে একটি গান শুরু করলেন।

— বাউল প্রেমিক, সনাতন বাউল (১৯৯৬), পৃ. ২০-২৩।

আমাদের কথা

এক অন্য গল্প দিয়ে শুরু করি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্লিনের কাছে ছোট জার্মান শহর উন্ডসর্ফ (Wundorf)-এর প্রিজন ক্যাম্পে বন্দি ছিলেন ব্রিটিশ আর্মির এক ভারতীয় সৈন্য, নাম মাল সিং, বাড়ি পাঞ্জাবের ফিরোজপুর জেলার রানাসুখি গ্রামে। Prisoner of War মাল সিং; আরো অনেক দেশের অনেক কয়েদীর সঙ্গে ২৪ বছরের এই যুবকটি দেশ থেকে বহু বহু দূরে নির্বাসিত। এদিকে, ১৮৯২ সালে টমাস আলভা এডিসন তাঁর রেকর্ডিং যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। সেই যন্ত্রে পৃথিবীর গবেষক মহলে ঝড় তুলেছে। এবং সেই সূত্র ধরেই উইলহেম ডোয়েগেন (Wilhelm Doegen) নামের এক ৩৯ বছরের জার্মান ভাষাবিদ রয়াল প্রাশিয়ান ফোনোগ্রাফিক কমিশনের হয়ে 'All the People of the World' শীর্ষক একটি সংগ্রহ স্থাপনের উদ্দেশ্যে, এডিসনের একটি যন্ত্র সাথে করে নিয়ে এসেছেন উন্ডসর্ফের প্রিজন ক্যাম্পে। এসে, কাঠের ব্যারাকে বসে, আরো অনেক কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তিনি মাল সিং-এর কণ্ঠস্বরটিও রেকর্ড করেন; রেকর্ডিং-এর দৈর্ঘ্য ১ মিনিট ২০ সেকেন্ড। এই রেকর্ডিংটি ফিলিপ শেফনার (Phillip Scheffner) বলে এক জার্মান সাউন্ড আর্টিস্ট তথা ফিল্মমেকারের নজরে আসে ২০০২ সালে, বার্লিনের হামবোল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে গবেষণা করবার সময়—ফাইল নম্বর PK 619। সাউন্ড আর্কাইভের হিমঘরের স্তব্ধতা ভেঙে দেয় মাল সিং-এর নৈর্ব্যক্তিক বয়ান : 'এক যুগে একটি লোক ছিল। সে ভারতে এক সের মাখন খেতো। সে দুই সের দুধ পান করতো। সেই লোকটি ইউরোপের যুদ্ধে এসেছিল। জার্মানির হাতে সে ধরা পড়ে। সেই লোকটি ভারতে যেতে ইচ্ছা করে। সে ভারতে যেতে চায়।' এই কণ্ঠস্বর থেকে জন্ম নিল শেফনারের আশ্চর্য মায়া-লাগানো ফিল্ম, *The Halfmoon Files*।

এক জায়গায় ফিলিপ শেফনার *The Halfmoon Files*-এর কথা বলতে গিয়ে ধন্দে পড়ে যাচ্ছেন। গল্পটা কোথা থেকে শুরু করব? শেফনার বলছেন, গল্পের শেষে এসেই শুরুটা কোথা থেকে হচ্ছে, তা স্থির করা যায়। '... how the story starts can only be decided at the end of the work. Chronologically seen, the discovery of traces of a complex historical link between India and Germany lies at the start of the work for the project "The Halfmoon Files".' কিন্তু তার পরেও

শেফনার গল্পের তিনটি পৃথক সূচনা স্থির করেন : possible beginning one, যেখানে মাল সিং প্রধান চরিত্র; possible beginning two, যেখানে এডিসনের গ্রামাফোন এবং ডোয়েগেনের 'All the People of the World' প্রকল্প থেকে গল্পের শুরু হয়; possible beginning three, যেখানে শেফনার সাউন্ড আর্কাইভে বসে মাল সিং-এর কণ্ঠস্বর শুনছেন।

অন্যদিকে, গল্পের শেষ নিয়েও বিস্তর জল্পনাকল্পনা করা যায়। যেমন, কিশলভস্কির (Krzysztof Kieslowski) *Blind Chance* ফিল্মে। গল্পের শুরু যেখানে fixed, কিন্তু বার বার সেই শুরু থেকে শুরু হয়ে গল্প অন্য অন্য দিকে চলে যায়, যার ফলে গল্পের পরিণতি পাল্টে পাল্টে যায়। এবং শেষ পর্যন্ত এমনই দাঁড়ায়, গল্পটার কোনো শেষই থাকে না যেন, যেন গল্পটা তার শুরু এবং শেষের অশেষ সম্ভাবনা নিয়ে চলতেই থাকে।

শক্তিগড়ের মাঠে সেদিন লোডশেডিং-এর ভিতরে কয়েকজন বন্ধু বসে ছিল। একটা রোডরোলারের মতন উঁচু গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। সেটা ছিল ২০০৫-এর গ্রীষ্মোত্তর এক সন্ধ্যা। সিগারেট-তামাকের ধোঁয়া আর অন্ধকারের ঘোরের ভিতরে গাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই বন্ধুদের মধ্যে কারো মনে হয়, এই গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে কোনো বাউল যদি গান গাইত? শক্তিগড়ের মাঠে যদি বাউল গান হতো? শক্তিগড়ের মাঠে যদি আমরা একটা বাউল গানের আয়োজন করতাম? শক্তিগড়ের মাঠে যদি আমরা একটা বাউল গানের আসর করি তাহলে কী করতে হবে? শক্তিগড়ের মাঠে আমরা যে বাউল গানের উৎসবটি করব, তার জন্য এবার তাহলে কী কী করতে হবে?

ধরা যাক, এরকমই ছিল শুরুটা। কিন্তু, যদি সেদিন লোডশেডিং না হতো, তাহলে উৎপলের ঘরে ফ্যান বন্ধ হতো না আর বাইরে মাঠে গিয়ে বসার দরকার হতো না, আর মাঠের অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু গাড়িটার দিকে চোখও যেত না। তাহলে তো এই এত কথা হতোই না। তাহলে কি ২০০৬-এর জানুয়ারির শুরুর উইকেন্ডে প্রথম বাউল ফকির উৎসবটি হতো আদৌ? আর যদি সেবার এই উৎসবটা শুরু না হতো, তাহলে আজ ২০১৫তে এই সময়ে বসে আমরা কে কী করতাম? কী কী করতাম আমরা?

'How the story starts can only be decided at the end of the work,' শেফনার লিখেছিলেন। আবার একই সঙ্গে বলেছিলেন যে, প্রজেক্ট 'Halfmoon Files' একটি 'work in progress'। আমাদের উৎসব কি

তেমনই একটি work in progress, না কি আমরা একভাবে একটা শেষে এসে পৌঁছেছি, আর তাই এত গল্পের possible beginnings, middles and ends নিয়ে কথা বলতে চাইছি?

কোনো ‘শেষে’ আমরা এসেছি কি না জানি না, তবে এটা ঠিক যে এটা একটা সংখ্যা বিশেষ হয়ে যায় আমাদের কাছে। সেই সংখ্যা আমাদের ভাবায়, ফিরে দেখতে বলে, সামনে তাকাতেও নির্দেশ করে। যেমন দশ, যেমন তিন। তৃতীয় বছরের বাউল ফকির উৎসবের পত্রিকায় অরূপ লিখেছিল (ভগিতাবিহীন লেখাটি অরূপই লিখেছিল আমি নিশ্চিত, কারণ তাতে মারফতের অরূপ দাসকে আমরা যারা কাছ থেকে জানি, তার শব্দের স্বাক্ষর অনায়াসেই চিনতে পারি—মোবা(উ)ল লিখবে আর কে?), ‘হয়ত বা বারে বারে তিনবারই’। তারপরে আরো তিন আর আরো তিন পার করে আপাতত দশে এসে দাঁড়ানো।

কী হতো সেদিন যদি লোডশেডিং না হতো উৎসবের ঘরে আর মাঠের ওপর সেই উঁচু গাড়িটা যদি না দাঁড়িয়ে থাকত? হতো না হয়ত মেলা, সেই ২০০৬-এর শুরুতে হয়ত হতো না, আর তারপর আমাদের অন্তরবর্তী জীবনগুলো অন্যরকম হতো। দশ দশটা জানুয়ারি মাসের প্রথম বা দ্বিতীয় উইকেন্ডে আমরা বুঝে পেতাম না কী করবো, সজীবের সঙ্গে শিল্পীর বিয়ে হতো না, চন্দ্রবতী মাসিমার ‘ধৈর্য না ধরিতে’ গানটা নতুন ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে ফিরত না, আর . . . এই possible endings ভেবে ভেবে অনেক সময় পার করা যায়। কিন্তু তারপরেও যে কল্পদৃশ্য অন্য এক ভাবনার দিকে নিয়ে যেতে চায় তা ওই সেই উঁচু গাড়ির ওপর বাউলের গান। বাউলের গানের কথাই ভাবল কেন ওরা? সেই ভাবনার পিছনে অন্য কোনো প্রস্তুতি কাজ করেছিল কি?

এই প্রস্তুতিই আসলে এই গল্পের একটা possible beginning। এই যে এক দল বন্ধু, একা একা বা একসাথে নানা কিছু শুনেছে, দেখেছে, ভেবেছে আর করেছে এত দিন ধরে; তারা, তাদের বন্ধুরা, বন্ধুদের বন্ধু—এইসব যোগই আসলে এই মেলা শুরু পিছনে কাজ করেছে। একই সঙ্গে সময়ও বুঝি বা প্রস্তুত হচ্ছিল একটু একটু করে। তা না হলে একদিন একটা মাঠে কে বা কাহারো একটা আইডিয়া ভাবল, আর অমনি সেই মাঠের মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল উৎসবের চারাগাছ—এরকম ঠিক হতো না। শুধু গাছ বেরলোই না, আশপাশের একতলা থেকে তিনতলা-চারতলা বাড়ি, আশপাশের চায়ের দোকান আর ক্লাবঘর সেই ছোট গাছকে ছায়া দিল, বাড়ির মানুষেরা জল দিলেন, রুটি খেতে দিলেন কেউ

কেউ। আর কাছের দূরের মানুষ যন্ত্র নিয়ে, গান নিয়ে আর কান নিয়ে; ট্রেনে করে, বাসে করে, পায়ে হেঁটে, রিক্সায় চড়ে এসে পৌঁছিলেন সেই মাঠে, উৎসবের গাছটিকে দেখবেন বলে, উৎসব করবেন বলে। এমনটাও এমনি এমনি হতো না, যদি না অনেক দিন ধরে নিজেরে অজান্তেই কোনো প্রস্তুতি দানা বাঁধতো আমাদের মনের মধ্যে আর এই শহরের আর সময়ের বুকে। তারপর তো একবার উৎসব-গাছটি লেগে যাবার পর সে খানিক নিজের নিয়মেই বড় হয়ে গেল।

‘নিজের নিয়ম’ এই জন্যেই বলছি কারণ, এই উৎসব কে বা কাহারো যে করেন, তা খুব একটা স্পষ্ট নয় সবার কাছে। আমাদের নিজেদের কাছেও নয় বোধহয়। স্পষ্ট করে দেবার তেমন দরকারও পড়েনি কখনো। হ্যাঁ, পার্থদাকে সবাই চেনে কারণ পার্থদা লম্বা আর পার্থদার কণ্ঠস্বর আর ম্যানারিজম আড়াল করবার মতো নয়; আর উৎপলের, ওরফে খোকনের বাড়িটিও সকলে জানেন কারণ ওরা এই পাড়ার পুরনো লোক আর উৎপল পাড়ায় বিশেষ সম্মানিত। আর কার্তিককে তো সবাই এমনিতেই চেনেন, একবার দেখলে ভুলবেন না পান্টুকেও। কিন্তু তারপরেও আরো অনেকে থাকে; আসে, থাকে, চলেও যায়। সেইসব detail ভিতরের লোকই খেয়াল রাখতে পারে না, বাইরের লোকের তা নিয়ে কী মাথাব্যথা? দিব্যেন্দু, বিপ্লব, চিত্র, মনীশ—ওরা সব আছে, না নেই? ওই যে নীল জামা পরতো যে অরূপ? আর একেবারে অন্য অরূপের মতন দেখতে সেই যে মানুষটা, অরূপেরই ভাই বুঝি, সে? বা টানা টানা চোখের ভারি সুন্দর দেখতে সেই মেয়েটা? কে আছে, কে থেকেও নেই, কে একেবারে মরেই গেছে—লোকজন অতশত খবর রাখে না। তারা জানে জানুয়ারি মাসে শক্তিগড়ের মাঠে একটা বাউল গানের মেলা হয়, ব্যাস। বাউলই ভাবে, ফকিরকেও বাউল ভাবে। এই পাড়ার পুরনো দোকান ‘দেসা’, এই ইব্রাহিমপুর রোডের ওপর, সেখানে একজন হাসি হাসি মুখে প্রায় প্রতি বছরই আমাদের খবর দেন যে মেলা কিন্তু হচ্ছে এবার! দিনকণ্ঠও জানিয়ে দেন। একবার কুষ্টিয়ার নজরুল ফকির মেলা-শেষে ট্রেনে করে জয়দেব যাচ্ছেন, সঙ্গে সাত্যকি, রবি; দরজার কাছে একটু দাঁড়িয়েছেন নজরুল, তারপর সীটে ফিরে এসে সাত্যকিকে খবর দিলেন যে ওই যে ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে আছে, ওরা বলছিল যে ওরাই নাকি শক্তিগড়ের বাউল ফকির উৎসবটা করল এই দুদিন আগে। এমনও শুনেছি যে সিনেমা-টিভি মহলে অনেকে এই মেলাকে পরমব্রতর মেলা বলে জানেন। আমরা ভেবেওছি যে এই অবস্থার কিছু সুযোগ হয়ত নেওয়া যায়। যেমন মেলায় টাকা পয়সার

টানাটানি প্রতি বছরই দেখা দেয়, মনে হয় শিল্পীদের সাম্মানিক, প্যাডেলের টাকা, সাউন্ডের টাকা বুঝি মেটানো যাবে না। তখন অনেকবার এই কথা বলি আমরা যে, আমাদের তো কেউ চেনে না, ঘাপটি মেরে পড়ে থাকলে কে বা কাহারা দায়ী, কেউ জানতেও পারবে না।

তবে, আত্মগোপন করার সেই সুযোগটা বুঝি আর রইল না। ২০১৫-র জানুয়ারিতে দশ বারের বার মেলা আর পাঁচ বারের বার আরশিনগর। একটা কিছু তো করা উচিত নতুন রকমের? যাকে বলে something commemorative? এবার আরশিনগর-এ তাই আমাদের মেলার কথা আমরা নিজেরাই বলেছি বেশি বেশি করে। possible beginnings-এর কথা, হয়ে ওঠার কথা। যার যেমন মনে হয়েছে এই দশ বছর ধরে, যার যেমন মনে আছে। বিকাশ, পারমিতা, সুকান্ত, মানস, অমিত, সাত্যকির লেখা নিয়ে সাজানো অধ্যায় ‘আমাদের মেলা’। লেখাগুলি স্বতন্ত্র, মানুষগুলো যেমন। এর থেকে বাউল ফকির উৎসব সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে, তেমনি এই লেখনী, ভাষা, বয়ানের ভিতরেই ভিন্ন ভিন্ন মানুষগুলো তাদের ভিন্নতা নিয়ে ধরা আছে। বিকাশ মুখচোরা, ওর বরাবর নিজেকে আড়াল করে রাখা স্বভাব; সাত্যকির দার্শনিক মন; পারমিতার পাঁচজনকে আগলে সামলে চলা; মানসের স্পেস নিয়ে অবসেশন, সুকান্তর সাউন্ড নিয়ে। অমিত বলছিল, প্রথমে একটা প্রশ্ন উঠেছিল: উৎসব, না কি মেলা—কী বলা হবে এই উৎসবকে, অথবা মেলাকে?

মেলা আর উৎসব এক নয়, উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মেলা হয়, আবার মেলার ভিতর উৎসবের আনন্দ ধরা থাকে। প্রথমবার গৌরচন্দ্র না করে গান শুরু করা হচ্ছিল যখন তখন গৌর খেপা নাকি বলেছিলেন—সাত্যকি লিখেছে—যে, এখানে অজ্ঞানের আসর হচ্ছে। তারপর বকুনি খেয়ে আসর বন্দনা করা হলো। এবং সেই থেকে প্রতিবারই হয়। ট্র্যাডিশনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন যাঁরা, তাঁরা আমাদের মতন মূল-ছিন্নদের কিছু কিছু শিখিয়ে দিয়ে যান। তারপর ক্রমে ক্রমে আমাদেরও কিছু রীতিনীতি তৈরি হয়ে গেল। কিছু ট্র্যাডিশনের ছায়ায়, কিছু একান্ত নিজস্ব। যেমন, প্রতি বছর মেলা শুরুর আগের রাতে পারমিতা পায়ের রাঁধে আমাদের close circle-এর জন্য। বা ৩১শে ডিসেম্বর, রাত বারোটোর পর মেলার পোস্টার লাগাতে চলে যায় এক দল, দেয়ালে দেয়ালে। আবার, তিথি নক্ষত্র মেনে উৎসব হয় না যদিও, তবু দু’দিনের আসর শেষ হয় মিলন দিয়ে। মালা পরে, আবির মেখে ফাগ খেলি আমরাও। উৎসবের ভিতরেই মিলন সংগঠিত হয়, উৎসব মিলনক্ষেত্র হয়ে যায়।

তাই আমাদের কাছে বাউল ফকির উৎসব মেলাও, উৎসবও। অমিত বলেছিল, লোগা তৈরির পর পার্থদা (মজুমদার) বলেছিল, লেখা যাক, 'সহজ ধারা সঙ্গ করো'। প্রশান্ত রায়ের গানের লাইন, 'যদি যাবি কৃষ্ণ দরশনে/ সহজ ধারা সঙ্গ কর'। এই 'সহজ'-এর অনেক মানে। যেমন, হিতেশ্বরজ্ঞান সান্যাল লিখেছেন, 'কৃষ্ণের জন্য গোপীদের যে একান্ত তন্ময়তা সেই কৃষ্ণপ্রেম (কামগন্ধহীন ও আত্মবোধবিরহিত) লাভই ইহাদের (অর্থাৎ, সহজসাধকদের একাংশের) সাধনার উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে গোপীদের মত মন থাকা চাই। কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাহারা কৃষ্ণপ্রেমে আত্মদান করিয়া থাকে।' (বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস, ১৯৮৯) পার্থদা কী ভেবে এই কথাটা বলেছিল জানি না। তবু সে-ই আমাদের স্লোগান হয়ে গেল। জান ওপেনশ (Jeanne Openshaw) লিখেছিলেন, 'The term sahaj . . . literally means "being born together with" and by extension "congenital, innate, hereditary, original and natural" . . . In modern Bengal, sahaj(a) also means "easy", "simple" and "plain".' (Seeking Bauls of Bengal, 2004) আমাদের ক্ষেত্রে হয়ত ওই natural আর easy, simple—এই শব্দগুলিই বেশি খাটে।

গৌতমদা (ঐতিহাসিক গৌতম ভদ্র)'র সঙ্গে এই বাজারের পথে যেদিন দেখা হলো আর দিব্যি সহজে ওঁর কাছে একটা লেখা চাইতে পারলাম, সেদিন ease/easy কথাটাই আমার মনে এসেছিল। আমি ভয়টয় পেলাম না মোটেও। (যদিও এখন এই পত্রিকা ওঁকে দেখাতে হবে ভেবে একটু ভয় পাচ্ছি। সম্পাদকের দায়িত্ব বাজে লেখা ফেলে দেওয়া, ভুল সংশোধন করা, বানানের সমতার দিকে খেয়াল রাখা, গৌতমদা বলেছিলেন। কিন্তু তেমন তো করা যায়নি এই পত্রিকায়। বাংলায় এতভাবে বানান লেখা যায় যে এক একজন এক এক ভাবে লিখেছেন আর আমরা একান্ত ভুল মনে না হলে, তাঁর বানান ও ভাষা অক্ষুণ্ণ রেখেছি। কিছুটা অবশ্যই কাজ কমাবার জন্য এবং সময়ের অভাবে, কিছুটা অজ্ঞানতায়ও।) কিন্তু সেই সব কথা থাক। এখানে যা বলার তা হলো, গৌতমদা ওপেনশ-সম্পাদিত বাউল রাজ খেপার জীবনী গ্রন্থটি নিয়ে লিখেছেন। এই আত্মজীবনী, ওপেনশ-কৃত তার সটীক সংস্করণ এবং গৌতম ভদ্রর সেই সংস্করণ পাঠ—এর ভিতরে একজন বাউলের জীবনের নানান possible beginnings-এর সূত্র ধরা আছে। গৌতমদা বলেছিলেন, রাজ খেপার এই অকপট জীবনী archival material হিসেবে অত্যন্ত মূল্যবান।

(এই প্রসঙ্গে মনে এলো, আমাদের বাউল ফকির উৎসবের বছরের পর বছরের রেকর্ডিং-এর কথা—হয়ত শুধু তা দিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ আর্কাইভ তৈরি করা যায়, যদি তার সঙ্গে এই বাউল ফকিরদের জীবনীও জুড়ে দেওয়া যায়।)

জীবন আর পারফরম্যান্সের যোগের কথা পারফরম্যান্স স্টাডিজের তরুণ গবেষক প্রিয়াঙ্কা বসুও লিখেছেন তাঁর ‘মেলা’ প্রবন্ধে। অন্যদিকে, পার্বতী বাউল ইন্সতি হালদারের সঙ্গে গল্প করেছেন তাঁর পরফর্মার জীবন, পারফরম্যান্স এবং পারফরম্যান্স স্পেস নিয়ে।

এইসব সিরিয়াস লেখা দিয়ে ঘিরে রেখেছি আমাদের trivia, অর্থাৎ নিজেদের ব্যক্তিগত impressionistic লেখাগুলিকে। আমাদের ঘরের ছেলেপিলেরা—বিরসা, ছন্দক, তিতলি, ভুতু, মিডি—যারা বড় হলো এই মেলার সাথে সাথে, তারাও কেউ কেউ তাদের মেলার গল্প লিখেছে, কেউ গল্প ঝঁকিয়েছে। লিখেছেন আমাদের কিছু শ্রোতাও, কারণ মেলাটা যতটা আমাদের, ততটাই তাঁদেরও। আবীরদা যেমন, যাঁকে অনায়াসে মেলার একজন একনিষ্ঠ সংগঠক বলে মনে করতে পারেন অনেকেই। অথবা শুভরত, কিংবা দীপ্তাংশু। বস্তুত, দীপ্তাংশুর তোলা ভিডিওতে মেলার, আখড়ার অনেক অমূল্য মুহূর্ত ধরা আছে, যা আমাদের নিজেদের সংগ্রহে নেই। ফলে আমাদের শ্রোতা আমাদের আর্কাইভিস্টও হয়ে গেছেন। শুভরতও রেকর্ড করেন প্রতি বছর; এই সেদিনই তো সুকান্তকে কী সব গান দিয়ে গেলেন যেন।

আমাদের মেলার কথা লিখতে গিয়ে অন্য মেলার কথাও এসে পড়ে। গুরপাল সিং-এর পুরীর সমুদ্রতটে Bring Your Own Film Festival (BYOFF)-এর গল্প শুনে সামান্য শ্লাঘা জন্মাল। এভাবে ওদেরও হয়েছিল তাহলে, এইভাবেই হয়। চাঁদা তুলে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে, উৎসবের আনন্দে। তওকীফদের কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল পারফরম্যান্স আর্ট ফেস্টিভালটি (Kipaf) যেমন। একটা কথা বলা হয়নি, এবারের পত্রিকা কিন্তু বাংলা-ইংরেজি মেশানো। এই প্রথম। বাংলা আর ইংরেজির সহজ সহাবস্থান আমাদের জীবনে, সেই কথাটা মনে রেখেই ভাষান্তরের দিকে গেলাম না আর। যে যার ভাষায় লিখুন, আমরা যতটুকু পারি রস নিই; সব ভাষা, সব কথা, সবার কথা তো কখনোই বোঝা বা বোঝানো যায় না। গুরপালের পাশে আছে আমেরিকার সাউন্ড আর্টিস্ট ও রেকর্ড কালেক্টর রবার্ট মিলিস-এর লেখা। রবার্টের নানা-দেশ-দেখা চোখ—তা দিয়ে সে আমাদের মেলাকে দেখেছে, আর দেখতে দেখতে মনে পড়েছে অন্য কোনো

মেলার কথা। সেই গল্পই শুনিয়েছে সে আমাদের। কথা বলার ফাঁকে নিজের রেকর্ড কালেকশনের ভিতর থেকে বার করে এনেছে ১৯১৯-এর একটি বাউল গানের 78 rpm রেকর্ড—প্রশ্ন করেছে তা নিয়ে, জানতে চেয়েছে, কে এই বাউল? কার গান রেকর্ড করা হয়েছিল ওই অতকাল আগে?

সৌম্যদা আমাদের ঘরের মানুষ, তবু সৌম্যদার লেখা ‘অন্য মেলা’ অধ্যায়ের ভিতরে রেখেছি। তার কারণ, ওঁর এই গানের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের মেলার চেয়ে অনেক পুরনো। খালেদ চৌধুরী, রামদয়াল মুণ্ডা, নীহার বড়ুয়ারদের মতন মহাজনদের ছায়ায় বেড়ে ওঠা সৌম্যদা। ওঁর কথা তাই আমরা মন দিয়ে শুনি, শুনে শেখার চেষ্টা করি। কারণ সৌম্যদা আমাদের শ্রবণকে শাণিত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

এবার পত্রিকায় যেমন লেখা রয়েছে অনেক, ছোট বড় নানা ধরনের লেখা, তেমনি অনেক ছবিও রেখেছি। শুধু ফটোগ্রাফের কথা বলছি না। অমিতের ডিজাইনের খসড়ার কথাও বলছি। আমাদের ভুতু (অরুপ-পারমিতার ছেলে) পাড়া বেপাড়ার দেয়ালে দেয়ালে ছবি আঁকে। সেইভাবেই মেলার একটা ছবি এঁকেছে ও। অন্যদিকে এই উৎসবের এক একনিষ্ঠ শ্রোতা, করিশমা সিদ্দিকি গান শুনতে শুনতে ছবি এঁকেছেন নানা সময়ে, তার থেকে আমাদের কয়েকটা ছবি উপহার দিয়েছেন। তখন আমার Michael Taussig-এর ফিল্ড নোটবুকের ওপর লেখা চমৎকার বইটির কথা মনে হচ্ছিল, *I Swear I Saw This*, যার শুরুতে এই কথাগুলি পড়ে আমি আমার নোটবুকে লিখে রেখেছিলাম: ‘To draw is to apply pen to paper. But to draw is also to pull on some thread, pulling it out of its knotted tangle or skein, and we also speak of drawing water from a well. There is another meaning too, as when I say, “I was drawn to her” . . . Drawing is thus a depicting, a hauling, an unraveling and being impelled towards something or somebody.’ আমাদের ছোট্ট মিতি (শ্রোতা-মানসের মেয়ে)-র জন্ম বাউল ফকির উৎসবের জন্মের পর। তাই ওর চেনা দৃশ্য-শব্দের জগতের ভিতরে বাউল ফকিরের দুনিয়া মিশে আছে, তাকেই ও বার করে এনেছে ওর লেখায় আর ছবিতে, like drawing water from a well.

দশ বছর আগে এক লোডশেডিং-এর সন্ধ্যায় একদল বন্ধু আমাদের এই মেলার মাঠে বসে এই মেলাটাকে কল্পনা করেছিল। তারপর মেলা হলো, বড় হলো,

যেমন যেমন হলো তা হয়ত সবার ভালও লাগল না। ইচ্ছে হলো সেই রোডরোলারের ওপর বাউলের গানের ছবিটা থেকে পুনরায় শুরু করতে। কিন্তু ততদিনে অনেকটা সময় চলে গেছে। তাই ফিরতে চাইলেও ফেরা গেল না আর। দশ বছর তো খুব কম সময় নয়। কে ভেবেছিল এই শক্তিগড়ের কলোনির মাঠে রামসেবকের দল সকালবেলায় ব্যায়াম করবে একদিন? কে জানতো ছোট বড় সমস্ত অনুষ্ঠানে বাউল আর ফকিরের গান এভাবে essential item-এ পরিণত হবে? কে জানত একদল মানুষ আমাদের এই উৎসবের ভিতরেই তাঁদের 'safeguarding intangible cultural heritage for socio-cultural empowerment'-এর raw material পেয়ে যাবেন? এইসবই হচ্ছে এখন। এবার কি তবে সত্যি সত্যিই নিজেদের গুটিয়ে নেবার সময় এসেছে? শেষবারের মতন উৎসব হচ্ছে এবার? এই কি তবে আরশিনগর-এর শেষ সংখ্যা?

এবারের আরশিনগর অনেকে মিলে করা। আবার, অনেক সমস্যার ভিতরেও করা এবারের পত্রিকা। যতখানি সময় দিতে পারলে একটা কাজ নিপুণ হয়, তেমন দিতে পারলাম আর কই? ফলে ভুল ত্রুটি অনেকই রয়ে গেল। শেষবেলায় প্রাণপন কাজ করলাম, কিন্তু তাতে যথেষ্ট হলো না। দশ বছরে এতটুকুও efficiency বাড়াতে পারলাম না।

মৌসুমী ভোমিক

বাউল ফকির উৎসব কমিটির হয়ে

কলকাতা ৪ জানুয়ারি ২০১৫

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মেলা—রচনার ধারা ও পদ্ধতির পুনর্বিচার

প্রিয়াঙ্কা বসু

ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে অনেকেই মেলার ব্যুৎপত্তিকে চিহ্নিত করেছেন ‘মিলন’, ‘মিল’ অথবা ‘মেলা’ (ক্রিয়া)—এই সমস্ত শব্দের মধ্য দিয়ে। মেলার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন ধরনের মানুষের একই জায়গায় সমাগম, সঙ্গম ও ক্ষণিকের অবস্থান। কিন্তু প্রত্যেক মেলার একটি নিজস্বতা থাকে এবং performance space হিসেবে মেলার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। শুধুমাত্র পশ্চিম বাংলা বা বাংলাদেশেই নয়, ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং প্রান্তেও। Performance space-এর দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্য মেলার আলোচনা বা সমীক্ষা-নির্ভর গবেষণা বেশ বিরল। ঔপনিবেশিক ভারতের প্রেক্ষাপটে বিহারের সামাজিক ইতিহাসে বাজার তথা মেলার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক Anand Yang তাঁর গ্রন্থ *Bazar India: Markets, Society and the Colonial State in Bihar* (1998)-এ লিখছেন কীভাবে মেলা একটি ধর্মীয় লেনদেন বা religious exchange-এর স্থান হয়ে ওঠে: ‘melas, on the other hand — save for the handful of fairs that attracted supralocal and supraregional audiences and were the focal point of significant mela pilgrimages — tended much more to be woven into the everyday fabric of people's lives’ (116)। বস্তুত, তীর্থযাত্রাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছাড়াও মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে মেলার যে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকার দিকটি লেখক চিহ্নিত করেছেন, তার সাথে মেলার performative aspect-এর যোগ গভীর ও অবিচ্ছেদ্য। মেলার গোড়াপত্তন থেকেই কীভাবে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলি asserted, তা নির্দেশ করে ঐতিহাসিক Yang বলেন, ‘fairs are bound up not only in a web of religious matters but also enmeshed in economic, social and cultural concerns’ (117)।

এই ‘cultural concern’-এর একটি স্বরূপ হিসেবে আমরা performance-কে ধরে নিতে পারি। এই performative aspect যে শুধু মেলায় অনুষ্ঠিত নাচ, গান, অভিনয় বা অন্য নানাবিধ ক্রীড়ার (indigenous sports) মধ্যেই সীমিত, তা নয়, মেলার performance-এর আওতায় চলে

আসে মেলায় অংশগ্রহণকারী মানুষের প্রতিদিনের (everyday) আচার, লৌকিক বিশ্বাস ও সামাজিক দলবদ্ধতার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া (effect and affect)। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গের মেলার সমাজতাত্ত্বিক ও সমীক্ষা-নির্ভর গবেষণা হিসেবে সুধীর চক্রবর্তীর *পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব* (১৯৯৬) ও উৎসবে, মেলায়, ইতিহাসে (২০০৪) দুটি সাম্প্রতিক আলোচ্য। পশ্চিমবঙ্গের নানা জানা এবং অজানা মেলার আলোচনায় লেখক কখনো এনেছেন মেলার যাত্রীদের হুবহু বর্ণনা বা verbatim record অথবা মেলার 'folk performance'-এর বদলের সম্ভাব্য কারণ। সুতরাং মেলার সামগ্রিক পর্যালোচনা (organicist analysis)-র প্রভাবে মেলার নির্মিতির সাথে performance-এর সম্পর্ক বা মেলায় ঘটমান কোনো মঞ্চাভিনয় আলাদা করে তাতে আলোচিত হয়নি, বরং performance-এর বিশিষ্টতা খানিকটা গোঁপ হয়ে গেছে।

কিন্তু, মেলার পরিপ্রেক্ষিতে performance এবং performance space-এর আলোচনা এত কম কেন? এই অভাবের একটি বিশেষ কারণ অবশ্যই নিহিত রয়েছে তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা ও প্রশাসকদের নিজস্ব মনোভাবের মধ্যে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও বিংশ শতাব্দীর সূচনাতেই মেলার গুরুত্ব বাড়তে থাকে প্রশাসকদের কাছে, বিশেষ করে মেলার পরিসংখ্যানের দিক থেকে। ICS ও লেখক অশোক মিত্র তাঁর *Fairs and Festivals in West Bengal* (1953) গ্রন্থের Foreword-এ প্রশাসকদের এই উদাসীনতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন: 'The Imperial Gazetteers published between 1880 and 1910 gave a minor place to these important seasonal markets or temporary inland ports. Even the District Gazetteers (1908-1918), which still are the fullest and most compact accounts of districts, make but casual mention of fairs and festivals in the country and attach little economic importance to them.' বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মেলা ও উৎসব প্রশাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পিছনে ছিল মেলা-সৃষ্ট মহামারীর বিরুদ্ধে দণ্ডমূলক ব্যবস্থা নেওয়া। এই সূত্রে Chas A. Bentley রচিত *Fairs and Festivals in Bengal*, (1929), Bengal Public Health Department-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি নিরীক্ষা এবং তার মূল বিচার্য অভিযুক্তগুলি ছিল জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষা, অতিরিক্ত নিয়মাবলী ও সংবিধিবদ্ধ প্রস্তুতি। Bentley-র পূর্বে ভারতবর্ষের বৃহত্তর প্রসঙ্গে ধর্মীয় মেলা ও উৎসব সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করেন Major Cecil

Henry Buck তাঁর *Faiths, Fairs and Festivals of India* (1917) গ্রন্থে। গ্রন্থের শুরুতেই Major Buck তাঁর রচনার উদ্দেশ্যটি তুলে ধরেন: 'to describe some of the chief ceremonies and festivals, and, in the last chapter, to give a few notes on the management of a large religious fair'। তিনি মনে করেন যে এর ফলে, তাঁর দেশের মানুষ ব্রিটেনের লক্ষ হাজার ভারতীয় প্রজার ধর্ম-চিন্তা সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাবে এবং তারা অনেক বেশি সহানুভূতিশীল হয়ে তাদের বুঝতে পারবে: 'to gain a slight idea of the religious views held by millions of British subjects in India and thus so sympathize with and comprehend them better'। যদিও Bentley-র নিরীক্ষা Major Buck-এর রচনার অনুসরণ ও অনুকরণেই রচিত, Bentley তাঁর লেখায় একটি অতিরিক্ত মাত্রা আনেন বাংলার ৮৪টি মেলার কালানুক্রমিক তালিকার মাধ্যমে। মেলা ও উৎসবের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে পরবর্তীকালের রচনাগুলিতেও এই নিরীক্ষানির্ভর পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে, উত্তর-ঔপনিবেশিক (post colonial) প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে, অশোক মিত্রের বৃহদায়তন নিরীক্ষা, 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা', পূর্ববর্তী রচনাগুলির ধাঁচেই রচিত। ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের Census Department একটি বই প্রকাশ করার পরিকল্পনা করে, যার বিষয় হিসেবে স্থির হয় রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার আচরণ, মেলা ও উৎসব থেকে পাওয়া survey data। অশোক মিত্রের survey প্রশ্নাবলী থেকে আমরা গবেষণার অভিমুখ (research perspective) সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারি। Survey প্রশ্নপত্রটি তিনটি ভাগে বিভক্ত: গ্রামের বর্ণনা, ধর্মীয় উৎসবের বর্ণনা ও মেলার বর্ণনা; মূল প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে survey-র অন্তর্ভুক্ত গ্রামের গঠন, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির প্রাচীনত্ব এবং মেলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। যদিও এই নিরীক্ষায় performance সংক্রান্ত আলোচনা ছিল না, তবুও কিছু প্রশ্নের মধ্য দিয়ে মেলার সাথে performance-এর যে সুদৃঢ় যোগাযোগ, তার পরিচয় পাওয়া যায়। Survey-এর প্রশ্নাবলী ছিল খানিক এইরকম:

- ১। মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা আছে?
- ২। খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক শো, জুয়া খেলা, লটারি, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা ইত্যাদির বর্ণনা।

- ৩। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান এবং অন্যান্য সাংগীতিক অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু কী?
- ৪। এই সমস্ত গান ও অভিনয়ের দলের মালিক কে এবং তারা কোথা থেকে আসেন?
- ৫। এই গ্রামের নিজস্ব কোনো দল আছে কি?
- ৬। দলের মালিকের নাম ও ঠিকানা কী?
- ৭। অনুষ্ঠিত গান বা বিষয়বস্তুগুলি কি পাঠানো সম্ভব?
- ৮। একই শিল্পী কি প্রত্যেকবার অংশগ্রহণ করেন?
- ৯। অনুষ্ঠানে আনুমানিক কত দর্শক আসেন?

এই সমস্ত প্রশ্নের মধ্যে ২, ৩, ৪ ও ৭ নং প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর survey-তে না পাওয়া গেলেও পশ্চিমবঙ্গের নানান চালু এবং বন্ধ হয়ে যাওয়া মেলার পরিপ্রেক্ষিতে performance forms ও performing groupগুলির বর্তমান অবস্থানের কথা জানা যেতে পারে এর থেকে। সেই সূত্রে এই নিরীক্ষাটি পুরোনো মেলা ও পুরোনো performance forms-এর পরিবর্তে শুরু হওয়া অনেক নতুন মেলা ও তার সাথে যুক্ত performance forms-এর দিকে ইঙ্গিত করে।

নতুন মেলা

মেলার সত্তার পরিবর্তনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ধর্মীয় মেলার ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে ওঠা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর। বিহারের মেলার পরিবর্তনের ধারাকে তুলে ধরতে গিয়ে ঐতিহাসিক Yang লিখছেন কীভাবে মেলা স্থানীয় জনসাধারণের ক্রম পরিবর্তনশীল ধর্মীয় আচার আচরণের সাথে তাল মিলিয়ে বদলাতে থাকে—‘continually evolving to keep pace with the changing sacred traditions of local society’। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বদেশী আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদের পটভূমিকায় বাবু নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠা হিন্দু মেলার (১৮৬৬) উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী মেলার এই পরিবর্তিত নতুন প্রকৃতির পরিচয় দেয়, যেমন দেশজ কৃষিবিদ্যার উন্নতিসাধন, ব্যায়াম ও শরীরচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতনতা বিস্তার এবং তার ফলস্বরূপ ব্যায়াম-সমিতি বা gymnasium-এর প্রবর্তন ও আবৃত্তি, গান, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদির মাধ্যমে স্বদেশীর ভাবনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করা।

রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার প্রভাবে নতুন ধরনের মেলাগুলির মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Wages of Freedom: Fifty Years of the Nation-State' (1998) রচনায় তুলে ধরেন যে কীভাবে একটি দেশের সাংস্কৃতিক সত্তা বা cultural identity কখনোই পূর্বনির্ধারিত/সহজাত বা natural নয়। সাংস্কৃতিক সত্তার নির্মাণ নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও মনোভাবের উপর এবং সেই সূত্রে তার সংস্কৃতির অতীত (cultural past)-এর অনুসন্ধান একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়। মেলা এবং উৎসবের প্রকৃতিগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও রয়েছে দেশের রাজনৈতিক অবস্থানের প্রভাব এবং দেশের সাংস্কৃতিক অতীত (cultural past)-কে তুলে ধরার জন্য মেলা ও উৎসবকে প্রদর্শনী হিসেবে দেখানোর প্রচেষ্টা।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে আমরা দেখতে পাই কীভাবে মেলার ও উৎসবের পরিবর্তন মানুষের পরিবর্তন-প্রবণ cultural taste এবং ক্রমবর্ধমান শ্রেণিগত পার্থক্যের ইঙ্গিত বহন করে। সরকারপ্রণীত মেলাগুলির সংখ্যা স্বাধীনতার পর থেকেই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই নতুন ধরনের মেলাগুলি কী ধরনের উদ্দেশ্য সাধন করে, তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাই যে এগুলি হয় সাধারণ শিক্ষার মাধ্যম (mass education medium) হিসেবে অথবা কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন ও কর্মের বার্ষিক উদ্‌যাপনের ক্ষেত্র হিসেবে উঠে আসছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক আয়োজিত আশানগর, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)-র কৃষি মেলা বা স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত হাবিবপুর (মালদা)-র সরকারি মেলা। অশোক মিত্রের নিরীক্ষা থেকে আমরা দেখতে পাই কীভাবে একদিকে বহু মেলার প্রাচীনত্বের কোনো সঠিক অনুমান নেই, এবং অপরদিকে কিছু নতুন মেলার বয়স মাত্র ১৫ থেকে ২০ বছর।

Art থেকে Souvenir

ধর্মীয় আচার-আচরণ থেকে সরে এসে মেলার এই নতুন ধর্মনিরপেক্ষ সত্তাকে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের প্রাথমিকভাবে মেলার দর্শক (যা বহুক্ষেত্রে নাগরিক বা urban audience) এবং তাদের cultural taste-কে বুঝে নিতে হবে। নতুন ধারা (new phenomenon) হিসেবে এই মেলাগুলি এই ধরনের

দর্শকদের cultural taste-এর জোগান দেয় 'folk' performance-এর মাধ্যমে। এর ফলে মেলা অনেক ক্ষেত্রেই শহুরে আধুনিক দর্শকের কাছে হয়ে ওঠে লোকসংস্কৃতির আখড়া। আমরা আগেই দেখেছি কীভাবে মেলার এই বিবর্তন cultural taste-এর সাথে সাথে শ্রেণী বৈষম্যকেও প্রকট করে তোলে। লোকসংস্কৃতির location হিসেবে মেলা শিল্পী/শিল্প ও দর্শকের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্ব বা aesthetic distance, তৈরি করে একটা শ্রেণীগত সামাজিক বৈষম্য, যা Pierre Bourdieu তাঁর 'Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste' (1984) রচনায় দেখিয়েছেন। সেই অর্থে মেলা ও উৎসব যে কোনো cultural object বা cultural performance-এর আধুনিকীকরণ করে তাকে শহরের পৃষ্ঠপোষক-দর্শক-ক্রেতার জন্যে বদলে দেয় একটি পণ্যতে; এর ফলে দর্শক-ক্রেতা হয়ে ওঠেন প্রান্তিক বা sub-altern বর্গের শিল্পী ও শিল্পের connoisseur। দর্শক-ক্রেতা ও শিল্প-বিক্রেতার মধ্যে এই যে সমীকরণ, তা এক বিশেষ ধরনের market economy-র সৃষ্টি করে যার মূলে রয়েছে মেলার পরিবর্তিত নতুন সত্তা। Nelson Graburn তাঁর *Ethnic and Tourist Arts* (1979) গ্রন্থে বলেন যে, এই নতুন বাজার অর্থনীতিতে art বা শিল্প কীভাবে এক বিশেষ ধরনের souvenir-এ পরিণত হয়, যাকে তিনি ব্যাখ্যা করেন 'handmade in a "plastic world" ' (3) হিসেবে।

মেলার এই নতুন রূপের সাথে তাল মিলিয়ে performance-এরও অনেক রদবদল ঘটে। মেলার performanceকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত হতে হয়। দর্শকের চাহিদা বা আয়োজকদের দাবী অনুযায়ী performanceকে adapt করতে হয়। এখানে উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মেলায় অনুষ্ঠিত কবিগান-এর কথা। গ্রামের কবিগানে কবির গান করেন রাত থেকে ভোর পর্যন্ত, অন্তত পক্ষে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা। সেখানে কবির লড়াইয়ের মধ্যে থাকে তর্কের বিষয়ের সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা, যা গানের সাথে সাথেই চলে। গ্রামীণ শ্রোতার সাথে কবির সম্পর্ক অনেকটা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মতোও বটে। অন্যদিকে নতুন মেলার কবিগানে আমরা দেখতে পাই ছোটো ছোটো উদাহরণের প্রাচুর্য এবং দীর্ঘ বক্তব্যের বদলে গানের অধিক ব্যবহার। কারণ এই মেলার কবিগান জানেন যে দর্শকের কাছে তাৎপর্য বিশ্লেষণের চেয়ে কবির লড়াইয়ের entertainment factorটিই অনেক বেশি কাম্য।

মেলা ও উৎসবের আঙ্গিকের এই আমূল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে

performance অবশ্যই creative ও cultural products-এর উৎপাদন, বন্টন ও আত্মীকরণের একটি কেন্দ্রবিন্দু। মেলা এবং উৎসবের যেমন কিছু সাংকেতিক তাৎপর্য আছে, সেইরকম location হিসেবে তা যে সমস্ত performanceকে showcase করে, সেগুলিকে আমরা সাংস্কৃতিক মূলধন বা cultural capital আখ্যা দিতে পারি। সাংস্কৃতিক মূলধনের অবস্থান সবসময়েই কোনো না কোনো প্রেরণ-পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে যাকে Pierre Bourdieu তাঁর 'Forms of Capital' (1986) প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করেন এইভাবে: 'The most powerful principle of the symbolic efficacy of cultural capital no doubt lies in the logic of its transmission' (19)। সুতরাং, মেলার পটভূমিকায় performanceকে আমরা এক ধরনের 'objectified' cultural capital হিসেবে ধরে নিতে পারি।

অন্যদিকে, মেলায় performance-এর স্থান একেবারেই আলাদা একটি প্রান্তে (যেমন শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায়) হলেও বা, মেলার performance-এর আকার ও আয়তন ছোটো হলেও, অনেক সময়ই তা performer-দের কাছে সাংস্কৃতিক মূলধন হিসেবে কাজ করে কারণ শহরের দর্শকের কাছে পরিচিত হওয়াও তাঁদের একান্ত কাম্য। এই পরিচিতি শিল্পীদের কাছে শ্রদ্ধা ও সামাজিক স্বীকৃতি হয়ে ধরা দেয়। অন্যদিকে মেলার performer-এর কাছে তার performance এমন একটি বিশেষ ধরনের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়, যা তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক মূলধন বা institutional capital। এই প্রাতিষ্ঠানিক মূলধনের ওপরে ভর করে অনেক লোকশিল্পী তাঁদের শিল্পকে (tangible ও intangible) নিয়ে যেতে চান একটি প্রতিষ্ঠানের গণ্ডির মধ্যে। সুতরাং performance-এর এই তিনটি স্তরের ভিতর দিয়ে যাওয়া—শিল্পকে শরীরে ধারণ করা (embodied অবস্থা) থেকে পণ্যে পরিণত করা (শিল্পী এবং শিল্পের objectified হওয়া) থেকে প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে পৌঁছানো (institutionalized হওয়া)—একে ব্যাখ্যা করতে মেলা এবং উৎসবের প্রেক্ষাপটে performance ও performer-এর ভূমিকা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগত পুনর্বিচার।

উল্লেখিত রচনা ও গ্রন্থপঞ্জী

- Bentley, Chas A., (1921) *Fairs and Festivals in Bengal*, Calcutta.
- Bourdieu, Pierre, (1984) *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, London: Routledge & Kegan Paul.
- , (1986) 'The forms of Capital' in J. Richardson (Ed.) *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, New York, Greenwood, 241-258.
- Buck, Cecil Henry, (1917) *Faiths, Fairs and Festivals of India*, Calcutta: Thacker, Spink and Co.
- Chatterjee, Partha (ed.), (1998) *Wages of Freedom: Fifty Years of the Indian Nation-State*, Delhi; Oxford: Oxford University Press
- Graburn, Nelson, (1979) *Ethnic and Tourist Arts*, Berkeley: University of California Press.
- Yang, Anand, (1998) *Bazar India: Markets, Society and the Colonial State in Bihar*. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press.
- চক্রবর্তী, সুধীর, *পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব*, কলকাতা, ১৯৯৬, পুস্তক বিপণী।
- , *উৎসবে, মেলায়, ইতিহাসে*, কলকাতা, ২০০৪, পুস্তক বিপণী।

প্রিয়াঙ্কা বসু সদ্য লন্ডনের SOAS-এ তাঁর ডক্টরেট থিসিস জমা দিয়েছেন, তিনি বাংলার কবিগান নিয়ে গবেষণা করেছেন।



ঢাকার প্রথম Hay Festival-এ কবিগানের আসর। ছবি: লেখক।

আমাদের মেলা

জড়িয়ে গেছি মনেপ্রাণে

বিকাশ সরকার

প্রত্যেক মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ, মান-অপমানের বিশেষ কিছু স্মৃতি থাকে। সেইসব স্মৃতি মনের গহনে কঠোর রূপে অক্ষুণ্ণ থাকে, যা মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। যারা একটু বেশি সংবেদনশীল বা ভাবাবেগপ্রবণ, তারা তো নয়ই। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ একটু বেশি মাত্রায় স্মৃতিনির্ভর হয়ে ওঠে আর বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ মানুষের হয়ত স্মৃতিরোমন্বন করেই দিন কাটে, কারণ তার জন্য আর কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না।

২০০৪ সালের শেষের দিকে আমার মায়ের জীবনাবসান হয়েছিল। আমার গরিব মা—ছোটোখাটো, শান্ত-স্নিগ্ধ, আজীবন আটপৌরে শাড়ি পরিহিতা মানুষটি। শৈশবের কথা মনে পড়ে। মা তাঁর স্বামী ও সন্তানদের খাওয়ানোর পর অনেক দিনই অর্ধাহারে বা অনাহারে থাকতেন, কিন্তু তাঁর জীবনে এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। মায়ের ক্ষেত্রে হয়ত ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব গুর্বো পরিবারে মায়ের এটাই রীতি বা ভূমিকা ছিল, যা এখনও আছে, হয়ত আগামী দিনেও থাকবে; যতদিন না ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক পরিবর্তন হবে।

সময়ে সময়ে ছোটোবেলার আরও অনেক কথা মনে পড়ে। সেই সব কথা মনে হলেই মনটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে ওঠে। দাদা যে কারাখানায় কাজ করত, সেটা যখন তখন বন্ধ হয়ে যেত। বাবা টিউশনি করে সামান্য আয় করতেন। ভক্ষণ করার সংখ্যা ছিল বেশি। মাঝে মধ্যে বাবার চাল-আটা কেনার পয়সা হত না। শীতকালে আমরা অনেক রাত্রেই সেকদ্ধ রাঙা আলু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম। মায়ের মৃত্যুর পর কেমন যেন লাগত। অনেক কিছুই ভালো লাগত না। বেশ কিছুকাল একটা শূন্যতা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আবার সময়ের নিয়মেই সব মুছে গিয়েছিল।

বাউল ফকির উৎসব প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে কেন মায়ের কথা লিখলাম, প্রসঙ্গক্রমে তার আভাস দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার বাবা-মা পূর্ববঙ্গের লোক। দেশভাগের কিছুকাল পর তাঁরা উত্তরবঙ্গের এক জেলা শহরে এসে ঘর বাঁধেন। সংসারে অনেক টানাপোড়েন ছিল। আমার শিশু বয়সে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে যাদবপুরে আসি। যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ডের কাছাকাছি বিভিন্ন কলোনি এলাকায় বসবাস করে বড় হয়েছি (বয়সে)। আরও কিছু বছর বেঁচে

থাকলে বানপ্রস্থের সময় হয়ে যাবে। উদরন্মের চাহিদায় বেশ কয়েকবার যাদবপুরের বাইরে গিয়ে থেকেছি, কিন্তু জীবনের শেকড়টা চিরকাল যাদবপুরেই থেকে গেছে। কোনোদিন আর কাটা গেল না। আমার প্রিয় মানুষজন, আমার প্রিয় আড্ডা, আমার প্রিয় বন্ধু-বান্ধব সব কিছুই এই যাদবপুরেই।

উৎসবের কথায় আসি। যাদবপুর বাউল ফকির উৎসব এখন শুধুমাত্র যাদবপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। উৎসবের কথা এখন জেলা থেকে জেলায়, ভিন্ন রাজ্য অতিক্রম করে দেশের বাইরেও পৌঁছে গেছে। বলা যায়, মিনি আন্তর্জাতিকতা পেয়েছে। উৎসবের এই সাফল্য, সুনাম, সুখ্যাতি আয় করার নেপথ্যে রয়েছে কিছু নব্য যুবক ও প্রাচীন যুবকের ঐকান্তিক চেষ্টা, বাউল ফকির শিল্পীদের একাত্মতা, স্থানীয় ক্লাব সংগঠন ও মানুষের সহযোগিতার সমন্বয়। পাশাপাশি বদনামও হয়েছে। তবে বদনাম বা দুর্নাম না হলে কোনো প্রচেষ্টাই পূর্ণাঙ্গ সার্থকতা পায় না। আমি একটা ব্যাপারে একই সঙ্গে বিস্মিত ও গর্বিত হই যে, বর্তমান সময়ের নিরিখে এই ধরনের একটা উৎসব কোনো কর্পোরেট সংস্থার আর্থিক বদান্যতা ছাড়াই বছরের পর বছর অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। অথচ উৎসব শুরুর দিন পর্যন্ত আমরা শঙ্কিত থাকি এই ভেবে যে, প্যাডেল, লাইট, মাইক, খাবারের খরচ উঠবে কী করে, শিল্পীদের পারিশ্রমিক দিতে পারব কিনা। সুযোগ ছিল, তবে আমরা প্রথম থেকেই এই ধরনের আর্থিক সাহায্য নেওয়ার বিরোধী ছিলাম। তাই, প্রতি বছর একটা অনিশ্চিত বাজেট সঙ্গ করেই অনুষ্ঠানের আয়োজন শুরু করতে হয়। শেষ পর্যন্ত উৎসব পর্বটা শেষ হয় মানুষের শুভেচ্ছায় ও নানাবিধ সাহায্যে। এটাই উৎসবের বড়ো প্রাপ্তি।

তখনও মা বিয়োগের মায়াটা মুছে যায়নি। ২০০৫ সালের পুজোর পর খোকন (উৎপল) একদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে এল। সঙ্গে অমিতও ছিল। পুরনো নতুন অনেক গল্প হলো, আড্ডা হলো। ওই সময় আমার শক্তিগড়ের আড্ডাটায় ছেদ পড়েছিল। সেদিনই উৎসব প্রসঙ্গে আমার সঙ্গে কথা হলো। খোকন যাবার সময় বলল, “সন্ধ্যাবেলায় আমার বাড়িতে আয়, আরও অনেক আলোচনা আছে।” অনেক দিন পর মনে মনে একটু সুখ হলো। খোকন আমার ছোটোবেলার বন্ধু। ওর সঙ্গে যে কোনো পরিস্থিতিতে কথা বলতে আমার ভালো লাগে। ছোটোবেলা থেকেই খোকন ছিল যথেষ্ট প্রতিভাবান। কিন্তু নিজের প্রতিভার প্রতি কোনোদিনই বিশেষ সুবিচার করেনি। ওর সঙ্গে আমার নিগূঢ় বন্ধুত্ব ছিল। আমি চিরদিনের জন্য অতি সাধারণ।

সেই কবে কতদিন আগে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় যেতাম। শখের দোকানদারি করার ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু বাউল গান শুনতাম। তারপর একবার কৈদুলির মেলায় গিয়েছিলাম। আমি, অরুণ ও খোকন সারারাত এ আখড়া সে-আখড়া ঘুরে বাউল গান শুনেছিলাম। অরুণও আমার ছোটবেলার প্রিয় বন্ধু। গত তিন বছর হল আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। ওর সুন্দর মুখখানা এখনও চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়।

সন্ধ্যাবেলা খোকনের বাড়ি গেলাম। আমাদের যত আড্ডা, মিটিং খোকনের ১৭ নম্বর শক্তিগড়ের বাড়িতেই হোত। একে একে সব এল। নতুন পুরনো বন্ধু-বান্ধব মিলে কুড়ি-পঁচিশজনের একটা উৎসব আয়োজক দল তৈরি হয়েছিল। ছিল সাত্যকি ও পাণ্ডুর মতো দুটো উজ্জ্বল অল্পবয়সি ছেলে। বিশেষ করে সাত্যকির মেধার প্রতি আমরা অনেকেই আকৃষ্ট ছিলাম। যারা আমাকে বন্ধু বলে ভাবত বা এখনও ভাবে, তারা প্রায় সবাই উচ্চশিক্ষিত, মেধাবী, গুণী মানুষজন। কলা বা শিল্প-সাহিত্যে তাদের ছিল যথেষ্ট পারদর্শিতা। আমি তাদের সান্নিধ্যে অনেক কিছুই জেনেছি, শুনেছি। কিন্তু তাদের গুণের ধারেকাছে পৌছোনের মতো যোগ্যতা আমার ছিল না। তবে তারা আমার কাজের প্রতি ছিল আস্থাশীল। আমি সব সময় তাদের এই বিশ্বাসকে মর্যাদা দেবার চেষ্টা করে গেছি।

মিটিং-এ কাজ-কর্মের, দায়-দায়িত্বের ভাগ বাঁটোয়ারা হলো। আমাকে প্রতিবারই লোকজন খাওয়ানোর দায়িত্ব নিতে হয়, শুধু প্রথম বছরটা ছাড় পেয়েছিলাম। এই দায়-দায়িত্ব দেওয়া নেওয়ার একটা বিশেষ কারণ ছিল। তখন আমি চাকরি বাকরি ত্যাগ করে ভাত খাওয়ানোর ব্যবসা করি। বন্ধুরা আমার ব্যবসার ধরন-ধারণ দেখে ঠাট্টা ইয়ার্কি করত। কারণ আমি আমার খাবারের গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সঠিক দাম চাইতে লজ্জা পেতাম। পাওনা টাকা পয়সা আদায় করার ব্যাপারেও ছিল অপারদর্শিতা। আবার চাহিদার অতিরিক্ত খাবার তৈরি করতাম। এসব দেখে পারমিতা কখনো কখনো রসিকতা করে বলত, “বিকাশ, তুমি না একটা লঙ্গরখানা চালু কর, আমরা গিয়ে বেশ খাব।” এসব কথাবার্তা আমার ভালোই লাগত। হিসেব মতো আমি একা মানুষ। নিজস্ব প্রয়োজন সামান্য। কোনো একটা সংসারে অবস্থান করলেও, সাংসারিক বিধিবদ্ধ দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিলাম। সবমিলে বন্ধুবান্ধবদের ধারণা ছিল, আমি এই দায়িত্বটা সঠিকভাবে নিতে পারব। টাকা পয়সার সম্বলান হোক বা নাই হোক,

উৎসবে আগত শিল্পীবন্ধুরা বা অতিথিজন ঠিক সেবা পেয়ে যাবেন। গত ৮ বছর এই গুরুদায়িত্ব পালন করে আসছি। কখনো সখনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলেও বন্ধুদের সহযোগিতায় সমাধান হয়ে গেছে।

আমি কখনো কোনোদিন নির্দিষ্ট মাপের খাবার তৈরি করাতে পারতাম না। আমার ভাঙারে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার থাকত। আমার এই অভ্যাসের পেছনে হয়ত কোনো মনস্তত্ত্ব ছিল। কিন্তু তার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারব না। আমার দোকানে মাঝে মধ্যে কিছু দুঃস্থ মানুষের আনাগোনা ছিল। তারা খাবারের খোঁজে আসত। তাদের ফিরিয়ে দিতে পারতাম না। ছোটবেলায় মা আমাকে অবিভক্ত বাংলার পঞ্চাশের (১৯৪৩ সাল) ময়মুহুরের গল্প একাধিকবার বলেছিলেন। যে দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ মানুষে ক্ষেফ না খেতে পেয়ে মারা গিয়েছিল। আত্মবিস্মৃত জাতি বাঙালি, সেই অভিশপ্ত অধ্যায়ের কথা প্রায় ভুলেই গেছে। তখন মায়ের বয়স ছিল ১৩-১৪ বছর। মা দাদুর সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী থেকে কিছু কিছু বাড়ির বড়দের অগোচরে বিতরণ করে দিতেন। সেই মানুষটির একদা করুণ পরিণতির কথা মনে পড়লে, এখনও এই বয়সে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এখন অনন্ত দুঃখের সমুদ্রে ভেসে গেলেও সময়টাকে আর সম্পাদনা করে ঠিক করা যাবে না।

প্রথম চার-পাঁচ বছর যথেষ্ট উদ্যোগ, উদ্দীপনা ও আনন্দপূর্ণ উৎসব উদ্‌যাপন হয়েছে। উৎসবে প্রায় প্রত্যেকেই সঠিকভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব সামলেছে। কখনো কারো ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হলে অন্যজন সামলে দিয়েছে। সুষ্ঠু-সুসংগত ভাবে দায়িত্ব পালন করার একটা ইচ্ছে ছিল। যদিও সুসংগতভাবে কাজ করাটা আমাদের অনেকের স্বভাবের পরিপন্থী। এরপর উৎসবের বয়স যত বেড়েছে, কাজের লোকের সংখ্যাও কমেছে। নিজেদের মধ্যে পছন্দ-অপছন্দ, মনোমালিন্য ইত্যাদি সংক্রামিত হয়েছে। কিংবা কেউ কেউ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে উৎসব ছেড়ে, দায়িত্ব ছেড়ে অব্যাহতি নিয়েছে। ফলে যারা থাকল তাদের খানিকটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। কাজের দায়িত্ব আরও বেশি বেশি করে কাঁধে চাপল। কিছু সুবিধা, অনেক অসুবিধার দোলাচলে উৎসবটা কিন্তু চলতে থাকল। মিটিংয়ে অনেক সময় উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব এসেছে ও আলোচনাও হয়েছে। বন্ধ করে দেবার ব্যাপারে আমিও সম্মতি দিয়েছি। কিন্তু দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার কঠিন সিদ্ধান্ত এখনো পর্যন্ত নিতে পারিনি। অন্তর চাইত না এমন একটা অনুপম গানের অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে

যাক। তাছাড়া এই গানের মেলা বা উৎসবকে ঘিরে বহু মানুষের ও শুভাকাঙ্ক্ষীর মনে একটা বাৎসরিক আবেগের সঞ্চার হয়েছে। তাঁরাও চান যে উৎসবটা বছর বছর অনুষ্ঠিত হোক। তাঁদের এই আবেগকে অতি সহজেই অবজ্ঞা করা যায় না। উৎসবের জন্য সমস্ত দৌড়ঝাঁপ, কষ্ট, চাপ, উত্তেজনার পর মঞ্চে যখন গানটা শুরু হয়, তখন দেহের সমস্ত ক্লান্তি মুছে যায়। মনে শান্তির ঠাণ্ডা বাতাস হিল্লোলিত হয়।

যদিও আমি গান বাজনার কিছু জানি না বুঝি না। সুর-তাল-লয় সম্পর্কে আমার কোনো ধারণাই নেই। তবে ছোটবেলা থেকে লোকগীতি, বিশেষ করে বাউল গানের প্রতি আমার একটা আসক্তি আছে। আমি মনে করি যাঁরা গান শুনতে ভালোবাসেন, তাঁরা বেশিরভাগই সাধারণ দর্শক-শ্রোতা। কোন রাগ-রাগিনীর মিলনে গানের সুর তৈরি হয়েছে, গানের সুরের কারিগরী কী বা কী গানের তত্ত্বকথা, এতকিছু না বুঝেও তাঁরা গান শোনেন। আমিও সাধারণ মানুষ ও সাধারণ শ্রোতা। তাই বাউল ফকির দর্শন ও গানের তত্ত্ব না বুঝলেও এই গান শুনতে আমার ভালো লাগে। বহু ভালো লাগা গানের ভাব আমাকে আকৃষ্ট করে। এই উৎসবের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ধারার বিশিষ্ট পদকর্তাদের রচিত গান বহু শিল্পীর কণ্ঠের মাধুরী দিয়ে শ্রোতাদের অভিভূত করেছে। গত কয়েক বছর ধরে প্রায় নিয়মিত বাংলাদেশের গুণী শিল্পীদের আগমনে উৎসবের উজ্জ্বল্য আরো প্রখর হয়েছে। উৎসব মজিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের খ্যাতনামা ‘কবির’ গায়করা ও উত্তরপ্রদেশের কাওয়ালির দল।

যাদবপুর বাউল ফকির উৎসবের একটা নিজস্ব শৈলী আছে। আর পাঁচটা উৎসবের সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলে না। এখানে আগত বাউল ফকির শিল্পীরা অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে অপেক্ষা করে থাকেন গান গাইবার জন্য। উৎসবটাকে একান্ত তাদেরই উৎসব ভেবেই অংশগ্রহণ করেন। উদ্যোক্তা, দর্শক কিংবা উৎসবের কাজে ব্যবসায়িক শর্তে যুক্ত মানুষজন—প্রত্যেকের কাছেই এই উৎসব তাদের স্বকীয় উৎসব।

বাউল ফকির গান বাংলার মাটির গান, মানুষের হৃদয়ের গান। এই গানে আছে মানুষকে কাছে টানার ঐন্দ্রজালিক শক্তি। বাউল ফকিরি গানের বিভিন্ন ধর্মমত, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন পন্থার সাধক-সাধিকা বা গায়ক-গায়িকা রয়েছেন। এ বিষয়ে আছেন বড় বড় তাত্ত্বিক, লেখক ও গবেষকগণ। আমি এ সবার বোদ্ধা নই। তবে একটা কথা আমার মনে হয় যে, একমাত্র বাউল গানই পারে হিন্দি গানের জনপ্রিয়তার কাছাকাছি পৌঁছোতে। দর্শক বা শ্রোতার

বারবার ছুটে আসেন নবনগর-শক্তিগড়ের মাঠে তাঁদের গান শুনতে। বহু মানুষের আগমনে উপচে পড়ে ভিড়। শক্তিগড়ের মাঠে তখন দুই দিনের মিলোনৎসব। তবে আমার আশঙ্কা এই উৎসবের আয়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এ বছর বাউল ফকির উৎসব ১০ বছরে পদার্পণ করল। অনেকেই আছেন, অনেকেই নেই। আনন্দের ধারাও আছে, বিরহের জ্বালাও আছে। অনেকের মাঝে শুধু একজনের অনুপস্থিতি আমি বিশেষভাবে অনুভব করি। গত তিন বছর যাবৎ যে উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। কারণে না অকারণে, এ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। সে উৎপল (খোকন)। খোকন ফাজলাম করে বলত, “যাক বাবা জীবদ্দশায় একটা কিছু করা গেছে।” কথাটার মধ্যে বোধহয় শ্লেষও ছিল, শ্লাঘাও ছিল, তবে শ্লেষটাই হয়ত ছিল একটু বেশি।

এই লেখার ভুলত্রুটির জন্য আমার অজ্ঞতা দায়ী। ১০ বছর ধরে উৎসবের সঙ্গে থাকা এবং উৎসব প্রসঙ্গে কিছু একটা লিখতে বাধ্য করাবার জন্য মৌসুমী ও সাত্যকিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। শেষে একজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়, সে আমাদের ছোটো শিল্পী। যে আমাকে উৎসবের বিভিন্ন কাজে গত তিন বছর ধরে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছে।

জয় গুরু!

Jan. 14, 15, 20, 30
 Feb. 12, 22, 24, 28
 March 15, 16, 24, 27, 28
 April 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Scanned with CamScanner

কমিটির ফ্রন্ট ডেস্ক থেকে

পারমিতা ভট্টাচার্য্য

চারপাশে একদা গড়ে ওঠা কলোনির মাঝখানে শক্তিগড় মাঠ বা বিবেকানন্দ ময়দান। গ্রীষ্মের সন্ধ্যায়, শীতের সকালে আশেপাশের পাড়ার মানুষজনের মতো এখানেই আমাদের অর্থাৎ উৎপল, অরূপ, বিকাশ, অমিত, বাপী, নার্তাস (অরূপ মুখার্জী), আমি, আরো কতজনের আড্ডা চলত। এরই মধ্যে হঠাৎ বাপীর কোনো রোজগার নেই। সবাই মিলে ঠিক হলো বাপীর রান্নাবান্নার দিকে তো বেশ ঝোক আছে, বাড়ি-বাড়ি রান্না করা খাবার সরবরাহের ব্যবসা ভালোই চলতে পারে। জায়গাও পাওয়া গেল; মাঠের ঠিক সামনে বলাই কাকুর পড়ে-থাকা দোকানঘর। সবাই মিলে কিছু কিছু টাকা জোগাড় করে ব্যবসার মূলধন। রবিবার দল বেঁধে বেরোলাম খাবার-দাবারের ছাপানো লিফলেট বিলি করতে। কেনা হল বাসনপত্র। দোকান চালু হবে। আগের দিন সন্ধ্যায় জানা গেল বাপী উধাও। সবার মাথায় হাত। তবুও সবাই মিলেই দোকান চালু করলাম। কেউ অনভ্যস্ত হাতে সকালের একটু ফাঁকা সময়ে মাছের ঝোল রাখছে, কেউ অফিস থেকে ফিরে রুটি বেলছি। দোকান কিন্তু রমরমিয়ে চালু। একটি ‘শিশু শ্রমিক’ বাড়ি বাড়ি খাবার পৌঁছে দিয়ে আসছে। কিছুদিন পরে ‘ক্ষুদিরাম’ বিকাশ চাকরি ছেড়ে দিলো, দোকানের পূর্ণ সময়ের দায়িত্ব নেবে বলে।

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া এই জন্যই যে, কিছু পাড়ার, কিছু বেপাড়ার বন্ধু, বিভিন্ন বয়সের বন্ধু, নানা সময়ে-অসময়ে, কাজে, আড্ডায়, একসঙ্গে রয়েই গেছে। এবং তারাই ২০০৪-০৫ সাল নাগাদ আড্ডা মারতে মারতে, নানা ধরনের গল্প, গান শোনা, নাটক-সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে নিতেই ভাবতে থাকে, নিজেরাই চেনা-পরিচিত বাউল-ফকির শিল্পীদের ডেকে এই মাঠে গান-বাজনা শুরু করলে কেমন হয়। ক্রমশ সাত্যকি, পার্থদা, আনন্দ, অর্পিতা, মৌসুমী, পাণ্টু, বিকাশ, অমিত, আরো কত বন্ধু এই উৎসাহে शामिल হয়। সবার এই ভালোলাগা, ইচ্ছেই ক্রমশ একটা সিরিয়াস মোড় নিল। ২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে হলো প্রথম ‘বাউল-ফকির উৎসব’। কোনো সংগঠিত প্রয়াস নয়। টাকা-পয়সার প্রবল টানাটানি। তার মধ্যেই ‘মারফৎ’-এর প্রথম ‘বাউল-ফকির উৎসব’। ‘মারফৎ’ হলো একটি অ-লাভজনক সংস্থা, যা চালায় অরূপ, পার্থদা, মনীশ, আরো কয়েকজন। এরা মূলতঃ রাজ্যের কিছু অনুন্নত অঞ্চলে শিশুদের নিয়ে কাজ করে। আবার এরাই

কেউ কেউ শক্তিগড়ের মাঠে আড্ডা দেয়, বাপীর ‘খাবারদাবার’ থকলের সঙ্গে জড়িয়ে থাক—ঘুরে ফিরে একই বন্ধুর দল, অথবা বন্ধুর বন্ধু।

প্রথম বছর মণ্ডপের বাইরে কমিটির একটা অফিস করা হল। পাশেই ইতিদির খাবারের দোকান। কমিটি অফিসে মনীশ, নার্সাস, আমি বা আরো কেউ বিল বই নিয়ে বসে থাকি। আশা, যদি শ্রোতারা খুশি হয়ে কিছু চাঁদা দিয়ে যান। প্রথম বছরের উৎসব ‘সুপার-হিট’ হয়, টাকা-পয়সার টানাটানি সত্ত্বেও।

দ্বিতীয় বছর কমিটির অফিস আর একটু সাজল। একটা ছোটো পত্রিকা বেরোল। সুকান্তর রেকর্ড করা আগের বছরের গানের সিডি বেরলো। এবার অফিসে বসে চাঁদা তোলা, আর সিডি, পত্রিকা বিক্রি করার কাজ। অফিসের ব্যস্ততা একটু বাড়ল।

চতুর্থ বছর থেকে উৎসবের দায়িত্ব নিল ‘মারফৎ’-এর বদলে ‘বাউল-ফকির উৎসব কমিটি’। তাতে অবশ্য উৎসবের আয়োজন বা পরিচালনায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন হলো না, সব কাজ একই ভাবে হতে লাগল, কর্মীও মোটের ওপর একই থেকে গেল। কিন্তু কমিটির অফিসের ব্যস্ততা ক্রমশঃ বাড়তেই থাকল। পত্রিকা, সিডি-র সঙ্গে যোগ হলো টি-শার্ট, পোস্টার, ক্যালেন্ডার—কত কী! গত পাঁচ বছর ধরে পত্রিকা অনেকটাই বড়, গোছানো ভাবে বেরোচ্ছে ‘আরশিনগর’ নামে। প্রথম দু’বছর সম্পাদক ছিল পার্থদা, তারপর থেকে নানা কারণে পার্থদা আর মেলার সঙ্গে নেই। পত্রিকা বার করার কাজ গত তিনবছর ধরে সামলাচ্ছে মৌসুমী। উৎসব ‘বাউল-ফকির উৎসব কমিটি’র পরিচালনায় শুরু হওয়ার পর থেকে অফিসে মনীশের উপস্থিতিও কমে গেছে। তার বদলে অফিস সামলে দিয়েছি আমরা কয়েকজন—নার্সাস, আমি, অপিতা, ইতি, মুনু, স্মিতা, শিল্পী—সবাই পালা করে। কেউ চাঁদার বিল কাটছি, কেউ জিনিস দেখাচ্ছি, কেউ টাকা গুনছি। ব্যস্ততার চূড়ান্ত! সকাল এগারোটা থেকে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত আমরা কেউ না কেউ অফিসে হাজির। এই অফিসেই রাখা থাকে একটা বাস্ক, যাতে শ্রোতারা নিজেদের খুশিমতো টাকা ফেলে দেন। সন্ধ্যায় যখন আসর জমে ওঠে, শ্রোতা-সমাগম বেশি হয়, তখন সাধু, ইতি, বাই হাতে ঢুকে যায় মণ্ডপের ভিতরে চাঁদা তুলতে। কিছু ভর্তি বাস্ক যখন ফিরে আসে, আমাদের কী আনন্দ!

উৎসব কমিটির এই অফিস এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে কোনোদিনই গান শোনা হয় না। কিন্তু দেখা হয় বহু মানুষের সঙ্গে। কারো কারো সঙ্গে বহু বছর পর। কারো খোঁজ করতে হলে লোকে এই অফিসেই আসে, আবার কারো

টয়লেট যাওয়ার দরকার হলে তার খোঁজেও লোকে এখানেই আসে। কোথাও কোনো রকম বিশৃঙ্খলা হলে মানুষ এখানে খবর দেয়। টিভি, খবরের কাগজের লোকজন তাঁদের খবর সংগ্রহ করতেও এইখানে আসেন। এই অফিসই হয়ে ওঠে মেলার মুখ।

এই অফিসকে ঘিরে আরো কত স্মৃতি। নার্সাস নিয়মিত ছিল এই অফিসে। ২০১১ সালে ও অসুস্থ হলো। ২০১২ সালের উৎসবেও টুকটুক করে এলো সেই অসুস্থ শরীর নিয়েই। নীল গরমজামা পরা নার্সাস এসে বসেছিল অফিসে। কিন্তু ২০১৩ সাল থেকে আর ও এলই না, আসবেও না আর। মুনুও বেশ কয়েক বছর এই অফিসের এটা-সেটা সামলাত। এ বছর থেকে আর ও-ও আসবে না।

২০১২ সালের উৎসবের প্রথম রাতে নেমেছিল মুষলধারে বৃষ্টি। পাড়ার ছেলেদের উৎসাহেই হলো পরের দিনের উৎসব, মেরামত করা মণ্ডপে। সন্ধ্যাবেলা উপচে পড়ল ভিড়। বৃষ্টি নামল দ্বিতীয় দিনও। দু'দিন সামলে দিলেও রাতে আর চাপ সহ্য করতে পারেনি মণ্ডপ। মণ্ডপ ভেঙে, যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে একাকার কাণ্ড। তারই মধ্যে বাঁচাতে হবে সব জিনিসপত্র, টাকা-পয়সা। যথারীতি বিকাশ—একটা মস্ত ট্রাক্সে সব ভরে মাথায় করে টলমল পায়ে বৃষ্টির মধ্যেই চলল উৎসবের ঘরে, যেটা ছিল আমাদের ব্যাক-অফিস।

শেষদিন ভোররাতে, যখন শিল্পীরা একে একে বিদায় নিতে চান, তখন এই অফিসে বসেই বিকাশ, সত্যকি আর আমি বসে তাঁদের হাতে বিদায়ী সাম্মানিক তুলে দিই। গত বছর ভাবছিলাম, আর তো মেলা হবে না, বেশ অনেক টাকা আছে হাতে। এই টাকা নিয়ে তিনজনে মিলে কিছুদিনের জন্য পালিয়ে গেলে কেমন হয়! কিন্তু ভাগ্যিস পালাইনি। এবছর তো আবার উৎসব—দশ বছর পূর্তি। কালীপূজো তিন বছর করতেই হয়, তেমনি উৎসবের দশ বছর না করলে তো পাপ হতো। তবে আমার মতে এই দশ বছরই শেষ। এবছর আর আমাদের পালিয়ে যাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না।

মুখছবি

অমিত রায়

আজ থেকে প্রায় দশ বছর আগে ২০০৫ সালের এপ্রিল-মে মাসের কোনো এক সন্ধ্যার আড্ডা। রোজকার মতো সেদিনও কাজকর্ম সেরে সকলে এসে হাজির হয়েছি শক্তিগড়। বেশ গরম পড়েছে। উৎপলের ঘরে না বসে মাঠে এসে বসা হলো। মাঠে তবু খানিক হাওয়া আছে। রোজ যারা এই আড্ডায় হাজির হতাম তারা কেউ কেউ চলে এসেছি। আনন্দ কখনো কখনো আসত আড্ডায়, সেদিন এসেছিল। তারপর উৎপল এল। সকলে গোল হয়ে বসে আছি।

এই আড্ডা ছিল আমার কাছে নেশার মতো। প্রায় রোজই যেতাম। নানা রকম কথা হত—সিনেমা থিয়েটার সংগীত সাহিত্য খেলা রাজনীতি, একে নিয়ে তাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা, মাঝে মাঝে পাগল অরূপের অদ্ভুত গল্প—এসবই হত।

এ কথা সে কথার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে উৎপল সেদিন হঠাৎই একটা প্রস্তাব দিল। বলল, ‘আচ্ছা এই মাঠে একটা বাউল গানের অনুষ্ঠান করা যার না?’ আমাদের সকলেরই বেশ লাগল এই আইডিয়াটা। আনন্দ বলল, ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন করা যার না?’ ওই শুরু। কত আইডিয়াই তো আমাদের মাথায় আসে—আসে, আবার মিলিয়েও যায় অন্য কথার ধাক্কায়। এটাও তাই হলো, এক-দুদিনের মধ্যে বিষয়টা ভুলে গেলাম। অন্যদের কথা জানিনা, অন্তত আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বেশ কয়েকদিন এই নিয়ে আর কোনো কথা ওঠেনি। কিন্তু উৎপল আবার একদিন তুলল কথাটা। মনে হল, ও খুবই সিরিয়াস এই বাউল গানের মেলার বিষয়ে। আমরা সবাই যেন তারপর একটু নড়েচড়ে বসলাম। এর কয়েকদিনের মধ্যেই বোঝা গেল বাউল ফকির মেলার ভাবনা শুধু ভাবনাই নয়, আর কিছুদিনের মধ্যে এই শক্তিগড়ের মাঠে বাউল ফকির গানের মেলা বসতে চলেছে, প্যাভেল হবে, লাইট জ্বলবে, মাইক বাজবে! পার্থদা নিলো শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব। কবে হবে এই উৎসব? ঠিক হল জানুয়ারি মাসের কড়া শীতে, এক পাশে শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা, অন্য পাশে জয়দেব কঁদুলি মেলা—জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহটাই মোক্ষম সময়। দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল, মনের মধ্যে শুরু হল রোমাঞ্চকর অস্থিরতা।

কী নাম হবে এই উৎসবের? এটা সেটা অনেক নামই বেরিয়ে এল কথায় কথায়। ‘বাউল ফকির মেলা’ না ‘বাউল ফকির উৎসব’? সকলের দেখা গেল

‘উৎসব’ই পছন্দ। নামটা ‘বাউল ফকির উৎসব’ হওয়াতে আমার খানিক সুবিধা হল, কারণ লোগো বানানোর দায়িত্বটা আমার উপরেই আসবে জানতাম, আর ‘বাউল ফকির উৎসব’ নামটা দিয়ে একটা-দুটো ডিজাইন-এর আইডিয়া আমার মাথায় আগে থেকেই ঘুরঘুর করছিল। কাজেই নামটা যদি ‘বাউল ফকির উৎসব’ না হয়ে ‘বাউল ফকির মেলা’ হতো সেটার নকসা কী হবে আমি জানতান না। তাই সময় লাগল না, এক দিনের মধ্যেই তিন চারটে ডিজাইন তৈরি হয়ে গেল। সেই তিন চারটের মধ্যে যেটা সকলের পছন্দ হল, সেটা আজ যাদবপুর বাউল ফকির উৎসবের মুখছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে ছবি আজ বহু বাউল ফকির প্রেমীর চেনা। পার্থদা বলল, ‘লোগোর নীচে লেখা হোক ‘সহজ ধারা সঙ্গ কর’।’ সবাই এক মত—সেই চলেছে।

এই করতে করতে কেটে গেল বেশ কিছু দিন। উৎসবকে সুন্দর করতে আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছি। টাকা পয়সা যোগাড় করা, শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা, মাঠ-কাউন্সিলার-পুলিশ পারমিশন, ফায়ার পারমিশন... আর আমার মূল কাজটা ছিল ছাপাছাপির কাজটা দেখা আর তার ডিজাইন তৈরি করা। নিমন্ত্রণ পত্র থেকে শুরু করে মঞ্চসজ্জা—সব। ঠিক হল মঞ্চসজ্জার প্রধান উপকরণ হবে বাঁশ, দেওয়াল হবে চট্ কিস্বা ত্রিপল দিয়ে গড়া—রঙিন কাপড় দিয়ে তা ঢেকে দেওয়া চলবে না। তাতে খরচও বাঁচবে। এই সব খুঁটিনাটি দিকগুলো আমি যেমন দেখতাম উৎপলও দেখত, ওরা দেখা ছিল খুব তীক্ষ্ণ। সেই সময় পান্টুও সাহায্য করেছে খুব এই সব সাজানো গোছানোর কাজে। আর পান্টু প্রচুর ছবি তুলত ওর নতুন ডিজিটাল ক্যামেরায়। একবার আমি বিপজ্জনক ভাবে মইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কাজ করছি আর পান্টু আমার দিকে ক্যামেরা তাক করে দাঁড়িয়ে আছে—ভাবটা এমন যে আমি পড়ে গেলেই ও ছবি তুলবে। মনে আছে, মঞ্চের পিছনে ‘বাউল ফকির উৎসব’ লেখা কমলা রঙের যে ব্যানারটা থাকে, সেটা আঁকতে গিয়ে পান্টু তার ওপর রঙের ফোঁটা ফেলে একটু নোংরা করে দিয়েছিল, দশ বছরে সেই রঙের ফোঁটাটা আজও অমলিন। আর মানস—আমরা যখন গভীর রাতে নানা রকম রঙিন কাগজ বা কাপড় দিয়ে মঞ্চটাকে সাজিয়ে তুলবার চেষ্টা করছি, মানস ওদিকে একটু রঙের খোঁচা দিয়ে অথবা এলোমেলো ক’টা রংবেরঙের গামছা টাঙিয়ে অথবা বিচিত্র সব জিনিসপত্র দিয়ে একমনে একটু একটু গড়ে তুলছে ‘মনের মানুষ’। ‘মনের মানুষ’ হল মঞ্চের পাশে একটু আড়ালে থাকা আমাদের একটা বিশ্রাম করার জায়গা। (এই এত দিনে ‘মনের মানুষ’-এর ভিতরে কতটুকু বিশ্রাম করতে পেরেছি সেটা অন্য কথা।) তবে গত বছর বিভিন্ন কারণে আমাদের সেই

‘মনের মানুষ’ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

এই উৎসবের নান্দনিক দিকটি দেখতে গিয়ে আমরা প্রথম থেকেই একটা বিষয়ে নজর দিয়েছিলাম যে, আর যাই করি না কেন, খরচ কমাতে হবে। তাতে পান্টু করল কি—খরবকাগজ ছোটো ছোটো করে কেটে তাতে হাতে লিখে এবং ঐকে প্রচুর পোষ্টার বানিয়ে ফেলল, দেখে বেশ লাগল। লিফলেট তৈরি করা হলো সবচেয়ে সস্তার পিচবোর্ডে (সাধারণ ভাবে যা ছাপার অযোগ্য)। কিন্তু সিল্কস্ক্রিনে ছাপার পর সেটা দেখতে হল চমৎকার, সস্তাও হলো খুব। মঞ্চের পিছনের বাঁশগুলোই তো সুন্দর—ওগুলো আবার টান টান চকচকে রঙিন কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। ক্যালেন্ডারও ছাপা হলো সস্তার ব্রাউন পেপারে। এইভাবে ধীরে ধীরে তৈরি হলো এই উৎসবের একটা নিজস্ব মেজাজ, একটা নিজস্ব চরিত্র। পাতলা ঘুড়ির কাগজ, রঙিন কাপড়, পুরানো শাড়ি, দড়ি, গামছা—এইসব সাধারণ, সহজলভ্য, উপকরণ দিয়েই তৈরি হয় আমাদের মঞ্চ। দুর্গা পূজোর প্যান্ডেল থেকে ফেলে দেওয়া জিনিসপত্র দিয়েও তৈরি হয়েছে। একবার কিরণ উৎসবের প্রায় দু’মাস আগে ভেঙে ফেলা পূজোর প্যান্ডেল থেকে ফিতের মতো লম্বা লম্বা নানা রঙের কাপড়ের টুকরো বস্তা ভর্তি করে রিক্সা করে নিয়ে এল, তাই দিয়ে আমরা সেবারে মঞ্চ সাজিয়েছিলাম। সাধু (দিলীপ) উৎসবের আগের রাতে প্রচণ্ড শীতে মাথায় একটা কাশ্মিরী টুপি পরে লম্বা একটা মই-এর টঙে উঠে সেই সব কাপড়ের টুকরো অতি যত্ন সহকারে বাঁশের জায়গায় জায়গায় রঙ মিলিয়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছে আর গভীর মন দিয়ে ভাবছে মঞ্চ প্রাণ এল কিনা। কিরণ লুঙ্গি পড়ে অবলিলাক্রমে তরতর করে উঠে যাচ্ছে বাঁশের মাথায় দড়ি বাঁধতে—অন্য দিকে হুঁশ নাই! এই মঞ্চ সাজানোর সময় দেখেছি তিতলি, ভুতু, বিরসা তাদের ছোটো ছোটো হাতে এটা ছড়াচ্ছে সেটা এগিয়ে দিচ্ছে—তারা এখন কিশোর কিশোরী—উৎসব নিয়ে দিচ্ছে নানান মতামত। (এই প্রসঙ্গে মনে এল, আরেক খুদে, ছন্দক, সেই কিন্তু প্রথম বছরের প্রথম চাঁদাটা দিয়েছিল—কুড়ি টাকা!)

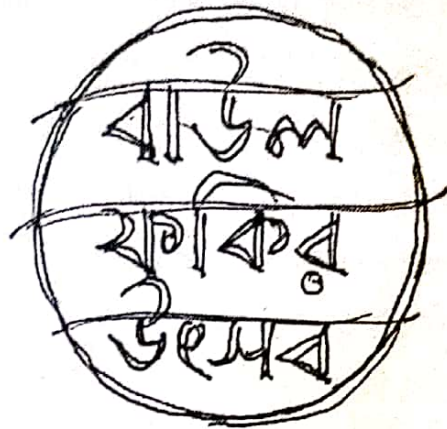
এই মঞ্চ সাজানোর সময় প্রায় প্রত্যেক বছরই দেখেছি নতুন নতুন মুখ, তারা কোথা থেকে আসে জানিনা, কে নিয়ে আসে তাও খেয়াল রাখি না, পরিচয় হয়, আবার হারিয়েও যায়—কিন্তু মন থেকে হারায় না সেই সব মুখগুলো যারা রাত্রিদিন জেগে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে হাসতে হাসতে এই মঞ্চটাকে গড়ে তোলে, মনে থাকে তাদের কথা যারা গানে গল্পে সারাক্ষণ সঙ্গে থেকে লম্বা লম্বা কঠিন সময়কে সহজ করে তোলে।

দেখতে দেখতে দশ বছরে পা দিতে চলেছে এই উৎসব। উৎসব ইতিমধ্যে

বড়োও হয়েছে অনেক। উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে মানুষের ভিড়। বেড়েছে খরচ। প্রত্যেক বছরই পড়তে হচ্ছে অর্থ সংকটে। ভাবা হচ্ছে টাকা জোগাড়ের নানান উপায়। উৎসবের নিজস্ব স্টলে বিক্রির জন্য তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন সামগ্রী, বেশ কয়েকটা সিডি, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, টি-শার্ট এই সব। বেরলো উৎসবের পত্রিকা 'আরশিনগর'। 'আরশি নগর'ও এ বছরে পাঁচে পা দেবে। বছর বছর এত কিছু ডিজাইন তৈরি করতে গিয়ে উৎপলের সাহায্য পেয়েছি প্রচুর। উৎপলও এই উৎসবের জন্য তৈরি করেছে নানা জিনিসের নকসা। তাই, গত দু'তিন বছর ধরে ও এই উৎসবে না থাকাতে, আমি পড়েছি বেশ মুশকিলে। যদিও অল্প সময়ের জন্য আমরা প্রত্যুষকে পেয়েছিলাম আর মানস তো আছেই, তবু উৎপল না থাকায় আমরা বেশ অসুবিধাই হয়।

প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরও প্রকাশ হবে নতুন সিডি, পোস্টার, ক্যালেন্ডার, টি-শার্ট, 'আরশি নগর'—এ বছরেও হবে অংসখ্য মানুষের সমাগম, গানে গানে উদ্বেল হয়ে উঠবে শক্তিগড়, আসবেন নতুন নতুন শিল্পী, গজিয়ে উঠবে নতুন নতুন দোকান, পরিচয় হবে নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে, হঠাৎ দেখা হয়ে যাবে ভুলে যাওয়া কোনো পুরানো বন্ধুর সঙ্গে। আবার অরূপ-দীপঙ্কর-মুনু ভাইয়ের মতো কিছু বন্ধুকে আর কোনোদিনও পাওয়া যাবে না এই উৎসবের আলোয়; সুবলদা, গৌর খ্যাপা, তিনকড়িদা আর কোনোদিনই আসবেন না আসর মাতাতে, বাংলাদেশের মাসিমা চন্দ্রবতী রায় বর্মণ—যাঁর গানে একদিন পাগল হয়ে উঠেছিল এই উৎসবের হাজার হাজার মানুষ—তিনিও চলে গেছেন।

কিছু হারানো কিছু পাওয়া, কিছু নিশ্চিত কিছু অনিশ্চিত, কিছু সম্ভব কিছু অসম্ভব—এই নিয়েই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল দশম বর্ষ বাউল ফকির উৎসবের। মাথার মধ্যে কিলবিল করছে নানা রকম ডিজাইন, নানা রকম নকশা—ক্যালেন্ডার, পোস্টার, আরশিনগর।



অমিতের rejected logo

বাউল ফকির উৎসব: ক্ষেত্র ও পরিসর

মানস আচার্য্য

‘২০০৬ সালে বাউল ফকির উৎসবের প্রথম বছরে বীরভূমের কানাই দাস বাউল হাউড়ে গৌসাইয়ের একটি পদ গেয়েছিলেন, সেই পদটি হলো, রসময় কী ট্রামগাড়ি ধরে বানাইয়াছে/সুযুগ্মার মধ্যপথে সর্বদাই চলতেছে,—এই পদটিতে উনিশ শতকের কলকাতার উত্তর চিৎপুর (চিৎপুরেতে চিত্বেশ্বরী/চতুর্দলের মধ্যে হেরি/ওই দলে গোকুলের বাড়ি/রাধাশ্যাম আছে) থেকে দক্ষিণে কালীঘাট (এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ/কালীঘাট জগৎ বিখ্যাত/তাহাতে সহস্র পদ প্রকাশ রয়েছে) পর্যন্ত ঘোড়ায় টানা ট্রামের যাত্রাপথটিকে মানবশরীরের চিত্রকল্প হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তখন পদটি শুনে মনে হয়েছিল, এই শহর যদি বাউল ফকিরদের গানের শরীরে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারে, তাহলে নিশ্চয়ই বাউল ফকিররাও এই শহরের শরীরে নিজেদের জায়গা করে নিতে পারবেন।’

আরশিনগর পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় ‘আমাদের কথা’র এই প্রথম কয়েক ছত্র এই লেখার প্রাথমিক রসদ। পদকর্তা গানের শরীরে কলকাতার উত্তর-দক্ষিণ মিলিয়েছেন, যাত্রা করেছেন—গানের সুর নিয়ে বাউল ফকিররাও জায়গা করে নিয়েছেন এই শহরে। আমিও আমার যাত্রাপথে উত্তরের দক্ষিণেশ্বর থেকে নিজেকে উজিয়ে নিয়ে এসে স্থাপন করেছি কালীঘাটেরও আরও দক্ষিণে যাদবপুরে। দু-পাঁচজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু ছাড়া মূলত কর্মক্ষেত্র এবং নিজস্ব একটা পরিসর খুঁজতে আমার দক্ষিণ কলকাতায় বাস। আমিও ধীরে ধীরে জায়গা করে নিয়েছি শহরের এই প্রান্তে। ছিন্নমূলেরও ছিন্ন হয়ে যাওয়া শরীরে কখনওই দানা বাঁধেনি উত্তর বা দক্ষিণী কোনও লক্ষণ। ভাষায় ছিল বাংলাদেশের টান, গলায় মায়ের রামপ্রসাদী বা কীর্তন। আবার জীবনের স্বাদ নিতে শিখেছিলাম শ্যামবাজার, হেদো কিস্বা কলেজস্ট্রিট, শিয়ালদহ হয়ে বড়ো জোর অ্যাকাডেমি-রবীন্দ্রসদন চত্বর।

দক্ষিণে এসে একটা জিনিস কেবলই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত তা হল, বাংলাদেশি উচ্চারণে কথোপকথন। তা সে সন্তোষপুরে চায়ের দোকান হোক বা এইট বি-র বাজার বা চায়ের গলি। কারণ আর কিছুই নয়—‘কলোনি’। এরকমই এক কলোনি শক্তিগড়। যাদবপুর ক্রমশই হয়ে উঠেছিল আমার আইডেন্টিটি, তা সে ভাষাগত হোক বা সাংস্কৃতিক। বাউল গান শোনার কান তৈরি ছিল

ছোটো থেকেই মায়ের মুখে শুনে শুনে। কলেজ জীবনে ওপার বাংলা থেকে বয়ে আনা সেই সুরের, কথার প্রতিধ্বনি খুঁজে পেতাম জয়দেব কিন্না পৌষমেলায় অথবা কলাভবন চত্বরে। তাই হয়ত ২০০৬ সালে শক্তিগড়ের বাউল মেলা টেনে নিয়েছিল আমায়। বন্ধুর সঙ্গে এইট বি থেকে খুঁজতে খুঁজতে পৌছে গেলাম শক্তিগড় মাঠ। বাউল মেলা শুরু হচ্ছে।

আমার মেলার ধারণা যেহেতু মূলত গ্রামীণ এবং সেখানে নেহাতই ‘বহিরাগত’ শহুরে আবেগ নিয়ে পৌছতাম হয়ত। কিন্তু শুধু কি তাই? জয়দেব ফেরত কলকাতায় এসে ছবি আঁকলাম অজয়ের স্নান। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলায় বাউলসঙ্গও কোনোদিন আমাকে দিয়ে আঁকাতে পারল না কাগজে, কী ক্যানভাসে—একতারা হাতে বাউলের ছবি। বরং সারারাত নিজের শরীর নিয়ে মেলার শরীরে মিশে থাকার আনন্দই বৃন্দ করে রাখত। রাতের গানের আসরের থেকে সকালবেলায় মাথার উপর প্লাস্টিকের ছিদ্র দিয়ে আসা রৌদ্রের আলোর বিন্যাস, চা-তামাক-আলাপচারিতা-গান—এ সবই আমাকে এক সামগ্রিক অনুষ্ঠানের অনুষ্ঙ্গ দান করত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় শরীর নিয়ে বসে থাকা, শরীরের সঙ্গে শরীরের কথোপকথন প্ররোচিত করেনি ছবি আঁকতে, ছবি তুলতে, গান বাঁধতে, বরং অনেক বেশি আনন্দ পেয়েছি সামগ্রিক পরিবেশ তৎসহ বিবিধ বিচিত্র মানুষের অনুষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করতে পেরে। অগ্রদ্বীপের মেলায়, রাতের বেলায় কোনো এক আশ্রমের বৈষ্ণবী যখন ডেকে নিয়ে অন্ন সেবা দেন এবং সারাদিনের শহুরে মানুষের ক্লান্তি এবং খিদে যখন নিরসন হয়, তখন তাও হয়ে ওঠে অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান।

মেলা-খেলায় বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণনা আমার এ লেখার উদ্দেশ্য নয় এবং আমি মনেও করি না বা দাবিও করি না আমি তার যোগ্য। বরং ‘মেলা’ এই শব্দটির সাথে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে শক্তিগড়ে ‘বাউল মেলা’—(হ্যাঁ তখনও ‘উৎসব’ বলতাম না যখন প্রথম আসি শক্তিগড়ের মাঠে) কে কীভাবে নিজের শরীরে নিয়ে নিলাম এই দশ বছরে, তাই খুঁজে ফেরার চেষ্টা এই লেখায়।

দক্ষিণে সীমিত বন্ধুবান্ধব তখন—প্রথম বছর—শক্তিগড় কলোনির মাঠ—চারদিকে ফ্ল্যাট বা দোতলা, তিনতলা বাড়ি—মধ্যখানে খড় বিছানো বসার জায়গা। চাঁদোয়া সহযোগে স্টেজ, বেশ একটা গ্রামীণ ভাবই—মেলার মাঠে পাড়ার মাসিমাদের দেওয়া দোকান, অনুষ্ঠান আসরে পিছনের সারিতে চেয়ারে বসে থাকা বয়স্ক কিছু মানুষ—সামনে খড়ের আসনে এক মিশ্র শ্রোতা—কলেজ ছাত্র, আমাদের মতো সদ্য কর্মজীবন শুরু করা প্রফেশনাল

থেকে বাজারের সবজি বিক্রেতা, চায়ের দোকানের কর্মচারী, পাড়ার কাকু-কাকিমা, উঠতি বয়সি ছেলেমেয়ে, এক বিচিত্র মিশ্রণ। স্টেজের পাশেই একটা পরিচিত মুখ। তখন ও সত্যজিৎ রায় ফিল্ম ইন্সটিটিউটের ছাত্র, সুকান্ত। প্রথম থেকেই শব্দ শিল্পী হিসেবে ও কাজ করেছে এই মেলায়। এদিকে-ওদিক চোখ পাতলে শিল্প-সাহিত্য-ফিল্ম জগতের আরও কিছু কিছু পরিচিত মুখ। মনে হতে লাগলো, কিছু পরিচিত আছেন এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে। অর্থাৎ আমরা যারা ছবি আঁকি, শব্দ বানাই, ছবি তুলি, কবিতা লিখি—লিটলম্যাগ করি, এরকম কিছু মানুষ আছেন তাহলে এই উৎসবের সঙ্গে জড়িত। তার মানে বেশ একটা সবার সাথে সবার দেখা হওয়ার জায়গা। মধ্যখানে বাউল গান। কলকাতায় এই রকম নিজেদের সঙ্গে নিজেদের দেখা করার, আমরা যেটাকে বলি ওই ‘সার্কিটের মধ্যে ঘোরাফেরা’—তা তো বছরে বেশ ক’বারই হয়। বইমেলা, ফিল্ম ফেস্টিভাল কিন্তু এ মেলার বৈশিষ্ট্যটা কী, যা প্রথম বছরেই আকর্ষণ করে ফেললো? উত্তর সেভাবে খুঁজিনি বা খোঁজার চেষ্টা করিনি। কিন্তু ভিতরে এই ভালোলাগার একটা কারণ তো অবশ্যই আছে।

এই প্রসঙ্গে, বছর তিনেক অর্থাৎ উৎসব শুরু হওয়ার ছ-সাত বছর অতিক্রান্ত এমনই এক উৎসব পরবর্তী সময়ে এক সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে ফোনালাপে প্রায় স্বগতোক্তির মতো গলায় উঠে এসেছিল কতকগুলি চিন্তা—যা হলো এই উৎসবের বিশেষত্ব এবং আমার চিন্তা প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে ছায়াপাত করা কতগুলো পয়েন্ট। নিজের শিল্প প্রকল্পগুলোকে যেমন সংজ্ঞায়িত করতে খসড়া রচনা করি আমরা, সেভাবেই বলে ফেললাম, আমার কাছে এই উৎসব মূলত একটি ‘কমিউনিটি প্রজেক্ট’। আজ আমরা যারা শিল্পচর্চাকারী, ক্যানভাস থেকে বেরিয়ে এসে ‘সেলফি’কে ছবির ফ্রেমে না বেঁধে রেখে বিভিন্ন কাক্সিক্ষিত স্থানকে বেছে নিই, যা ‘সাইট স্পেসিফিক’ বলে দাবি করি এবং শিল্পকে শুধু আমার চিন্তার প্রকাশ না ভেবে সামগ্রিক দেওয়া-নেওয়ার প্রকাশ ভাবি, সেখানে আমার আমার সঙ্গে দর্শক/শ্রোতার এক আদান প্রদান ঘটে শরীরি মাধ্যমে। শিল্পের অঙ্গনে অবাধ প্রবেশ দর্শক আর উপভোক্তার, এবং যা কিনা সামগ্রিকভাবে জন্ম দেয় এক স্থানিক শিল্পের।

’৯০-উত্তর সময়ে আমরা যারা খণ্ডিত স্বত্তার খোঁজে শিল্পচর্চা শুরু করি, শক্তিগড়ের এই নাগরিক আবহে বাউলগানের পরিসর সেই খণ্ডায়নকে কোথাও যেন স্যাটিসফাই করে। উত্তর আধুনিক যে অরৈখিক (নন লিনিয়ার) বৈচিত্র্য এবং খণ্ডস্বত্তা, তার সব কিছুই যেন বহন করে এই উৎসব। তাত্ত্বিকভাবে হয়ত

অনেক রকম ভাবেই এই উৎসবের চরিত্রকে (যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে এই উৎসবের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা ভালো বলতে পারবেন) সংজ্ঞায়িত করা যায়, তা সে উৎসবের মূল ব্যানারের design থেকে স্টেজ design-এর minimalism হোক বা মেলার উদ্যোক্তা হিসাবে Local Community Participation হোক।

কমিটির কোষাধ্যক্ষ তথা খাবারের দায়িত্বে থাকা বিকাশ দা কিংবা পাড়ার সাধু বা অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বাড়ি থেকে রাতের রুটির যোগান কিংবা যে বাড়ির একতলা ভাড়াটে সবে ছেড়েছে অথবা নির্মীয়মান বহতলের ইটপাঞ্জরের মধ্যে গড়ে ওঠা স্থান, তা হয়ে ওঠে বাউল ফকিরদের থাকার জায়গা। এভাবেই নাগরিক কাঠামোয় স্থান করে নেয় বাউল ফকির উৎসব এবং এই উৎসবে আসা মানুষজন। উলটোদিকে শহরের বুকে বাউল-ফকিরদের intervention—হ্যাঁ, প্রথম দিকে intervention শব্দটা ধরা দেয়নি। কিন্তু কার্তিকদাস বাউল, গোলাম ফকির, আরমান ফকিরদের এই মেলাকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যম যত না নাগরিকদের বাউল সঙ্গ, তার থেকেও নাগরিক পরিসরে বাউল ফকিরদের intervention বলা যায় গত দশ বছরে বিচিত্র থেকে বিচিত্রতর রূপ পেয়েছে বিভিন্ন পরিসরে। কিন্তু শক্তিগড়ের রূপ দিনে দিনে শহরকে দিয়েছে এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। এই তিন দিন শক্তিগড় কলোনি যেন হয়ে ওঠে এক মুক্ত বিস্তার। শহরের অন্য কোথাও কোনো অনুষ্ঠানে যা পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। শুধু গান শোনার পরিসর অপেক্ষা আমার প্রিয় বাউল ফকিরদের সঙ্গ করব, দেখা হবে অন্য কোনও বাউল মেলায় পরিচয় হওয়া শিল্পী বা শ্রোতার সঙ্গে, ভাব জমবে কোনও এক নির্মীয়মান বহতলের এক ফালি জায়গায়। শত অসুবিধের মধ্যেও তৈরি হয়ে উঠবে গান বা তব্বকথা শোনার জায়গা। সেভাবে কোনও ওয়ার্কশপ নয়, শুধুমাত্র যাতায়াত বা এক বহতলের থেকে অন্য বাড়ির গ্যারাজ, সেখান থেকে ক্লাবের এক টুকরো ঘিরে দেওয়া অংশে—যা গত আট বছরই গৌর খ্যাপার স্থায়ী জায়গা ছিল। এমন জায়গায় সময় কাটিয়ে দেওয়া—চটের দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারা মুখগুলোর মধ্যে হঠাৎ পেয়ে যাওয়া কোনও পরিচিতকে। গ্রামীণ পরিসরে যে সাধুসঙ্গের মেলা, তারই এক খণ্ডচিত্র যেন উঠে আসে এই তিনদিনে। রায়দীঘির বাবলু হোক বা রায়গঞ্জের অশোক, তাদের সাথেই minimal art-এর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে উদয় হন মুম্বইবাসী চিত্র পরিচালক, জার্মান সাংবাদিক, নরওয়ের শিল্পী অথবা বেলজিয়ান অনুষ্ঠান শিল্পী।

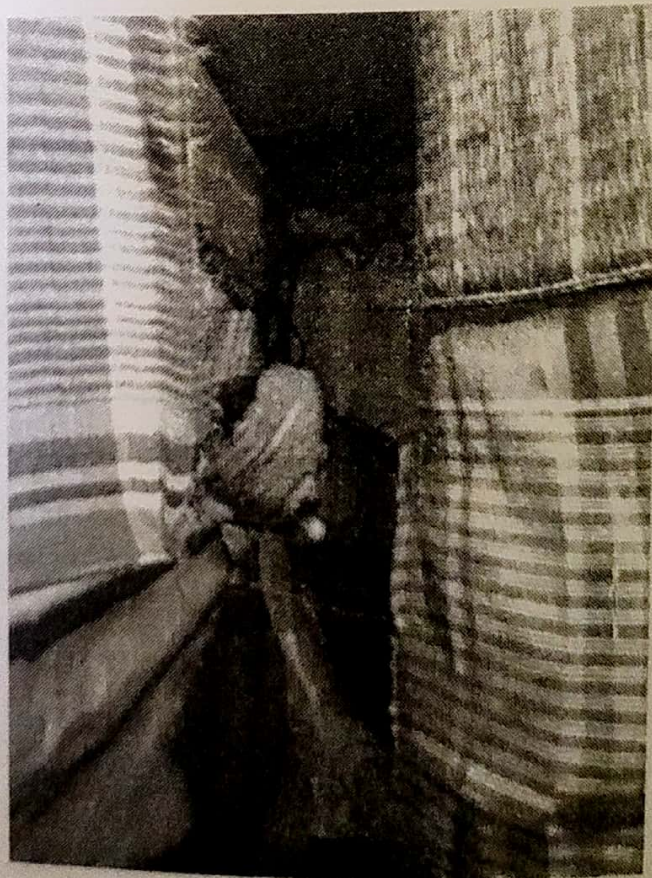
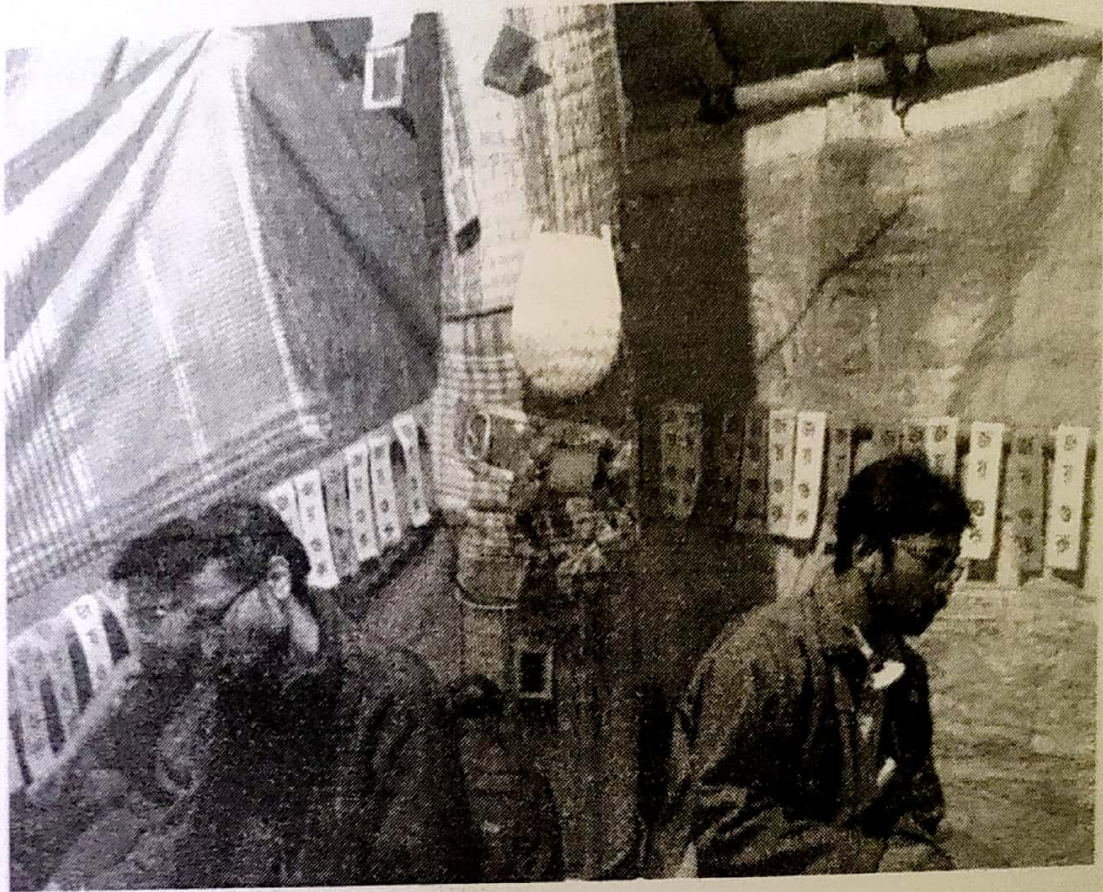
এর ভিতর পাওয়া অন্যতম আড্ডাস্থল হিসেবে মাঠ সংলগ্ন ‘মামু’র চায়ের দোকানে ভোরবেলায় বাউল ফকিরদের চা সেবনের জন্য সমাগম শীতের আমেজমাখা জানুয়ারির সকালকে এক অন্য মাত্রা দেয় যা প্রতিদিনকার প্রাতঃভ্রমণকারী অথবা নিত্য বাজার যাত্রীর কাছে, সমসাময়িক অপরাজনৈতিক দুর্ব্যবহারে গত দু-এক যুগের মধ্যেই ফ্যাসিস্ট চরিত্র নাম পাওয়া ‘জয় গুরু’ সম্বোধন অতিক্রম করে কলোনির কিছু মানুষকে হয়ত টেনে নিয়ে যায় স্মৃতিতে বেঁচে থাকা ফেলে আসা দেশভূমির আবহে। উৎসব প্রাঙ্গণকে কেন্দ্র করে কে কোথায় স্থান পেয়েছে নিজের কম্বলটি বিছিয়ে শোওয়ার জন্য, সেই তথ্য আদান-প্রদানেরও কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে ‘মামু’র চায়ের দোকান। কারণ হয়ত সেই ভোর রাতেই বীরভূম থেকে রাতের ট্রেন ধরে এসে পৌঁছেছেন রাধেশ্যাম বাউল বা কানাইকাকা। চা খেতে খেতেই কানে আসা রঞ্জিত গৌঁসাইয়ের প্রভাতী বা বাংলাদেশ থেকে আসা টুনটুন ফকিরের প্রভাতী, সকালের মিঠে রোদ গায়ে মেখে, পাড়ারই বৃদ্ধ কয়েকজন, কেউ চেয়ারে, কেউ মাটিতে বসে শুনছেন আর ফিরে যাচ্ছেন হয়ত কোনো অতীতে, যা এই নাগরিক পরিমণ্ডলে তাঁর কাছে ছিল দূরতিগম্য। শহুরে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে হঠাৎ করে এই এক টুকরো স্মৃতি অথবা ডিফারেন্স। নাইবা গেলাম সে তত্ত্বকথায়।

উৎসবের দ্বিতীয় বছরেও আমি মূলত ছিলাম বহিরাগত শ্রোতা, শুধু মনে আছে রাতের বেলায় মেলার পিছনে তৈরি হওয়া ছোটো আখড়াতে বসে গান করেছিলাম—যা আমার এক প্রথম অভিজ্ঞতা কারণ এই রকম স্পেস-এ গান বরাবর শুনে এসেছি, গান করার সাহস হয়নি। কিন্তু শক্তিগড়ের মাঠ আমায় সেই রাতে ভাব দিয়েছিল হয়ত। সেই আমার যুক্ত হওয়া। তৃতীয় বছরের আগেই ঘটনাচক্রে শক্তিগড়েই বাসস্থান হল আমার। এরই মধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে সাত্যকি, পাণ্টুদের সাথে এবং ওদেরই হাত ধরে উৎপলদার বাড়ি—পরিচয় হল পার্থদা, অরুণদা, মৌসুমীদি, অমিতদা, বিকাশদা, পারমিতাদির সঙ্গে। মৌসুমীদিকে অবশ্য ছাত্রাবস্থা থেকেই চিনতাম অন্যভাবে, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ডিরোজিও হল অথবা বিজ্ঞান বিকাশের বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সে এক ‘অন্য সময়’! আর এখন ২০০৬ পরবর্তী সময়ে উৎপলদার বাড়ি যা এলাকায় বাউল ফকির অফিস নামে পরিচিত রিক্সাওয়ালাদের মুখে, তাই হল প্রতি সন্ধ্যার আড্ডার জায়গা। ২০০৭ সালের নভেম্বরের কোনও এক সকালে ২০০৮ সালের মেলার প্রস্তুতি হিসেবে মেলার ডিজাইনের একজন সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলাম মাঠে। সেই বছর থেকে, মেলার চরিত্রকে মাথায়

রেখে সামগ্রিক স্পেসের মধ্যে স্টেজ সংলগ্ন গাছটিকে অবলম্বন করে একটা space within space-এর পরিকল্পনা করা শুরু হল—যা অনেকটাই স্টেজের গ্রিন রুম টাইপ। সবাই মজা করে বলত ‘মনের মানুষ’। রাতের বেলা stage design করার সাথে সাথে অমিতদা, সাধু, ক্যাপ্টেন আমরা সবাই মিলে ওই জায়গাটাও সাজাতাম। আমার কাছে ওটা একটা intimate space create করার মতো ছিল। Space-টার উপকারিতা ছিল, রাতের বেলা অনেকে, যারা বাড়ি বা হস্টেল ফিরত না, এরকম বন্ধু-বান্ধব পরিচিতরা থেকে যেতে পারত।

আগেও বলেছি, আবারও বলছি, এই মেলার চরিত্রে মূল অনুষ্ঠান মঞ্চ ছাড়াও ছোটো ছোটো বিভিন্ন পরিসর তৈরি হয় বিভিন্ন বাউল ফকির ও তাঁদের দলকে কেন্দ্র করে, যা খুবই একটা ‘personal space’ হিসেবে সমগ্রের মধ্যে থেকে যায়। আমার পরিকল্পনায় ওই জায়গাটাও ছিল সেরকম একটি space within space create করার চেষ্টা। কিন্তু পরবর্তী কালে অর্থাৎ শেষ দুই বছর এই পরিকল্পনা আর বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করিনি মূলত প্রবল দর্শক সংখ্যার জন্য। কারণ, স্টেজের সংলগ্ন হওয়ায় এবং সামগ্রিক প্যাভেল কাঠামো খুবই minimum হওয়ায় সন্ধ্যার অনুষ্ঠানের সময় ওই spaceটি আর সেরকম personal থাকতে পারত না। খুব সহজেই তা তখন হয়ে যেত অত্যাশাহী দর্শকের স্বর্গ। নিরাপত্তার এবং সঞ্চালনার স্বার্থে তাই তখন আমরা ওই spaceটি create করা থেকে বিরত হই। বরং উৎসাহিত হয়ে পড়ি অন্যরকম design intervention-এ। তা সে টি-শার্ট হোক বা ক্যালেন্ডার। ওই spaceটির installation-এ একাধিক শিল্পীর intervention থাকত। প্রতি বছর যারা হয়ত সরাসরি যুক্ত হচ্ছিল না কমিটিতে, বরং তাদের শিল্পচর্চার একটা প্রকাশস্থল ছিল। যেমন ভাবে এক বছর পুরো প্যাভেলটার ছাদ অলংকৃত হয়েছিল টুনি বাব্ব দিয়ে। মাঠে designer স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই করেছিল সেই কাজ। কিংবা বলা যায়, অরুণদার ঘোড়া—সেবার মেলার মাঠে ঘোড়াটি ঘুরে ঘুরে ঘাস খাচ্ছিল। আমার কাছে এটাও ছিল এক অনুষ্ঠান (performance)-এর চিন্তা। একটি performance, এক এক বছরে এক এক রকম বিবিধ ঘটনাবলি মেলার চরিত্রকে দিয়েছে বিভিন্ন রূপ। অথবা মেলার মাঠে ‘মনের মানুষ’ থেকে শুরু হওয়া তওফীকের performance যা মেলার মূল অনুষ্ঠানে গান চলাকালীনই অন্যান্য বিবিধ কার্যকলাপের মধ্যে ঘটে চলেছিল। বাউল ফকির গানের অনুষ্ঠানে এ সব কিছু মিলিত রূপই এ শহরে এক অন্যধারার উৎসবকে তুলে ধরেছে সেবার কাছে। কোনো রকম স্পনসরশিপ, সরকারি সহায়তা ছাড়াই

এই উৎসব জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শুধু শহরের নয়, দেশ বিদেশ থেকে আসা বিভিন্ন মানুষকে সুযোগ করে দিয়েছে নিজেদেরকে অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। সবাই যে তার মধ্যে বাউল গানের শ্রোতা তা বলা যায় না অবশ্যই। কিন্তু বাউল ফকির গানের অনুবন্ধেই প্রিয় মানুষগুলি বছরভর দেখা না হওয়া বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়াসেই হয়ত ভিড় জমান জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহান্তের দুটো দিন। বাউল ফকির উৎসব সততই হয়ে ওঠে এক মিলন ক্ষেত্র এই নাগরিক পরিসরে। দু'দিনের এই উৎসব প্রকৃত অর্থেই হয়ে ওঠে একটি 'Public art' alongwith a private space।



মানসের 'মনের মানুষ'

সাউন্ডম্যানের বাউলমেলা

সুকান্ত মজুমদার

বাউল-ফকির উৎসব দেখতে দেখতে দশ বছরে পা রাখল। নানা চড়াই-উৎরাই, টাল-বাহানা ও বিবিধ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়েও যে দশ বছরের মাইল-ফলক ছুঁয়ে ফেলা গেল, সেটা কিন্তু কম ব্যাপার নয়। সবথেকে বড়ো কথা, নানারকম ফাঁদ এড়িয়ে উৎসবের স্পিরিটটা একইরকম থেকে যাওয়া।

এই উৎসব মূলত শোনার উৎসব। তাই প্রথম বছর থেকেই গান রেকর্ড করার ব্যাপারে আমরা উৎসাহী ছিলাম। আমার মনে আছে, প্রথম বছর, ২০০৬ সালে সত্যিকি এসে বলেছিল, ‘সুকান্তদা, একটা উৎসব হচ্ছে বাউল-ফকিরদের নিয়ে, তুমি কি একটু অনুষ্ঠানটা রেকর্ড করবে?’ তো সুকান্তদা সেই যে লেগে পড়লেন আর এর থেকে বের হতে পারলেন না! মাঝে একটা বছরই, তৃতীয় বছর, আমি উৎসবের সময় ছিলাম না। আফগানিস্তানে ছিলাম। আমার মনে আছে কাবুলের প্রচণ্ড ঠাণ্ডায়, চারদিক বরফে ঢাকা ধূসর আবহাওয়ায় বসে মেলার দু’দিন খুব এখানকার কথা মনে পড়েছিল। সন্কেবেলা একা ঘরে বসে মৌসুমীকে মেল করেছিলাম যে এখন নিশ্চয়ই প্রচুর গান হচ্ছে, তোমরা খাওয়া-দাওয়া করছ, হৈ-হুল্লোড় করছ, আমি কোথায় বসে আছি তার ঠিক নেই। খুব দুঃখ হয়েছিল মনে আছে। সেবার বোধহয় আমাদের মেলার শব্দ-কারিগরি দলের আর একজন স্থায়ী সদস্য, অয়ন, প্রায় একা হাতে সব কিছু সামলে দিয়েছিল। আমাদের ফিল্ম স্কুলের মাস্টারমশাই রাজ্জাকদাও বোধহয় অয়নকে কিঞ্চিৎ সঙ্গ দিয়েছিলেন। যাই হোক, সেই শেষ। আমি আর কোনোদিন মেলার সময় কলকাতার বাইরে থাকিনি।

মেলা এখন দুর্গোৎসবের মতোই আমাদের কয়েকজনের কাছে একটি বছরকার উৎসবে পরিণত হয়েছে। নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য, টাকাপয়সা তুলতে না পারার অনিশ্চয়তা, রাজনৈতিক ফিকিরের ধাক্কায় বিভিন্ন সময়ে মনে হয়েছে এই মেলা বন্ধ হয়ে যাওয়াই ভালো। আর পারা যাচ্ছে না। মেলা হয়ে যাবার পর সবাই হাঁপ ছেড়ে বলেছে, বাপরে এই শেষ, সামনের বছর থেকে আর নয়। তারপর বছর গড়িয়েছে। পূজো যেতেই সকলের মনে হৈমন্তিক উদাসীনতা... দু’একটা ফিসফাস... দু’তিনজনের মধ্যে গুজগুজ... তারপরেই গলা খাঁকারি দিয়ে কেউ হয়ত শুরু করল, মেলাটা কি তাহলে বন্ধই

হয়ে যাবে? তো বন্ধই যখন হয়ে যাবে, একটা মিটিং হোক, সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হোক মেলা বন্ধ করার। তারপর মিটিং বসেছে। সবার মনে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব থাকলেও মেলা বন্ধ করার প্রস্তাবও এমনকি পাকা হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরই সেই মায়ার খেলা, পুরো দস্যু মোহন সিরিজ। ‘কোথা হইতে কি হইয়া গেল, মোহন মিলাইয়া গেল’র মতই কোথা হইতে কি হইয়া গেল, মেলা ঠিক হইয়া গেল। আমার তো এই ‘কোথা হইতে কি হইয়া গেল’র উপর খুব ভরসা হয়েছে। এবং আমার সন্দেহ এই দলে আমি একা নই। মনে মনে ‘ভরসা করি এ ভব কাণ্ডারী’ গুনগুনিয়ে মিটিং-এ অলরেডি বেশ কয়েকবার আমরা বলে নিয়েছি, দশ বছর তো হয়েই গেল, মেলা তো এবারেই শেষ। তুকতাকে ভরসা হবে নাই বা কেন? গত একবছরে মেলা তো শুধু শক্তিগড়ে হয়েই ক্ষান্ত দেয় নাই, মেলা-মাতৃকা মেলার এক ভাই প্রসব করেছেন। উত্তরবঙ্গে গত গ্রীষ্মে সোৎসাহে সেই সহোদর উৎসব পালন হয়ে গেছে বিভিন্ন গানের মানুষকে জড়ো করে। তার নাম দেওয়া হয়েছে মহাকাল। আমাদের তীব্র আর্কাইভ-প্রিয়তা সেখানেও আমাদের পিছু ছাড়ে নাই। আমি ছিলাম না। কিন্তু রেকর্ডিং ঠিক হয়েছে। কম্পিউটার ছিল না তো কুছ পরোয়া নেই, ক্যাসেটেই হয়েছে। আমি জানতামও না। কয়েকদিন আগে সজীব খানকয়েক ক্যাসেট এনে বলল যে, এই হল মহাকালের রেকর্ডিং, দেখো কি করতে পার। নেহাত আমাদের ক্যাসেট প্লেয়ার খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে, নয়ত কে বলতে পারে, এই মেলাতেই আপনারা সেই সহোদরের শাব্দিক পরিচয়স্বরূপ একখান করে সিডি হস্তগত করতেন হয়ত।

তো এই হল আমাদের মেলার স্পিরিট। মন্বন্তরে মরিনি আমরা। বাই দ্য ওয়ে, স্পিরিট কে কি আপনারা চেনেন? সেই যে বাছুরের সাইজের বিরাট কুকুরটি—বিভিন্ন অশুভ শক্তিকে মেলার মাঠ থেকে দূরে রাখার জন্য অরূপদা একবার যাকে মাঠে চক্কর খাওয়ানো হোক বলে প্ল্যান দিয়েছিল? ওর নাম স্পিরিটই ছিল তো, নাকি? যাই হোক, এই স্পিরিটের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে মেলার সঙ্গে যুক্ত সকলের নিজস্ব স্পিরিট, নিজস্ব সন্ধানের কথা ভাবছিলাম। আসলে এই সন্ধানের ব্যাপারটা আমার কাছে তেমন পরিষ্কার ছিল না। ঘটনাচক্রে আমার লেখার আগেই মেলার পত্রিকার জন্য মানসদার (মানস আচার্য) লেখাটা তৈরি হয়ে গিয়ে হাতে এল। পড়ে ভাবলাম, এটা ঠিকই যে, আমাদের সকলেরই এই মেলার সঙ্গে যুক্ত হবার একটা নিজস্ব কারণ, গভীর

করে বললে নিজস্ব একটা খোঁজ রয়েছে। কেন আমি এই মেলায় এই কথাটা ভেবে দেখবার মতো। এই মেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, পরে বিযুক্ত হয়েছেন, এমন কারো লেখা পাওয়া গেলে এই খোঁজ তত্ত্বটা আরো ভালো করে জানা যেত। অন্তত আরো কয়েকখান perspective পাওয়া যেত। সে সম্ভাবনা নেই। সুতরাং নিজের মধ্যেই একবার ডুব দেওয়া যাক।

আমি শব্দের লোক। আর মেলা হল ধ্বনির উৎসব। Festival of Sound। বিভিন্ন ধ্বনির মিলনক্ষেত্র। আমি এই মেলায় হাজির হয়েছি যত না গানের তত্ত্বের খোঁজে, মহৎদের সঙ্গে লোভে, তারচেয়ে ঢের বেশি নৈরাশ্যজনক একটি কারণে। সে হল গানের ধ্বনি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল, আমার এক ছাত্রের সঙ্গে ক'বছর আগে মেলায় দেখা হল। সে তখন তুরীয় অবস্থায় ভাবের জগতে বিরাজমান। তার মাস্টারের মাইকের পজিশন ঠিক করা, কেবল ফল্টের কারণে দৌড়াদৌড়ি, সাউন্ডের সঠিক ব্যালান্সের খোঁজে হাঁকপাঁক—এই দশা তার সঙ্গত কারণেই পছন্দ হয়নি। সে আমার ওই প্রবল ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে পাকড়াও করে বোঝাতে বসল, আমার কর্মের নিষ্ফলতা। তার পৃথিবী তখন আনন্দের সাগরে ভাসমান, চারপাশে ভাব ও তত্ত্বের বন্যা বইছে, তার মাঝে আমার এই জাগতিক ও ইলেকট্রনিকের পিছনে ছুটোছুটি ওর একেবারেই ভালো লাগেনি। আমি জানি ও ওর মাস্টারের ভালোই চেয়েছিল। হায়, নিজের ভালো কোনো মানুষই যে চট করে বোঝে না। জগতের এ-ই নিয়ম। 'দুগ্ধ ফেলিয়া মদ্য' আমি সেই প্রথম বছর থেকে খেয়ে চলেছি, আমাকে ঠেকানো সে কি এক অর্বাচীন ছাত্রের কর্ম!

মেলার প্রথম বছর থেকে চেষ্টা করে আসছি বললে বোধহয় ঠিক বলা হবে না, তবে ধ্বনির নেশার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব রুচি ও ফিল্ম স্কুলের শিক্ষা অনুযায়ী একধরনের ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাটা বিবর্তিত হয়েছে ধীরে ধীরে বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে। আস্তে আস্তে একটা টিম তৈরি হয়েছে। অয়ন, সুজয়, সব্যসাচী, শান্তজিৎ, রাকেশ, অর্ক অনেকেই এসেছে। কেউ কেউ এ নেশায় মজেনি। অচিরেই এ ধকল সইতে না পেরে চলে গেছে। যারা টিকে আছে, তারা গানের নেশাতেই আছে সম্ভবত। সাধুগুরু যাঁরা এ মেলায় আসেন, আমাদের শব্দ-কারিগরি দলের লোকেদের সঙ্গে তাঁদের তেমন দেখা সাক্ষাৎ হবার সুযোগ ঘটে না। স্টেজ থেকে কেউ বড়োজোর বললেন গলাটা একটু বাড়াতে বা বাঁশিটা একটু বাড়াতে, ব্যাস ওইটুকুই। কেউ কেউ অবশ্য সিডির খোঁজে আসেন আমাদের কাছে। হীরা শা যেমন, প্রত্যেকবার এসে আমাকে জিজ্ঞেস করবেনই

যে তাঁর গান সেবারের সিডিতে আছে কিনা। গানটা কেমন হয়েছে, মেলায় গাওয়া তাঁর গানগুলো আমি আলাদা করে একটা সিডিতে তাঁকে কবে তুলে দেব ইত্যাদি বিবিধ জিজ্ঞাসা তাঁর। আমি প্রত্যেকবার বলি মেলার সময় আলাদা করে সিডি করা সম্ভব নয়, আপনি অন্য সময় যখন কলকাতায় আসবেন বলবেন। সেই সময় তাঁর আর হয় না। ফলে এই একই কথোপকথন হীরা শার সঙ্গে বছরের পর বছর আমার চলছে। রাধেশ্যাম দাস যেমন আর একজন। প্রত্যেকবার প্যাভেলের পিছনে সাউন্ডের জায়গায় এসে জিজ্ঞেস করবেনই যে, 'দেব' এসেছে কিনা এবং উনি নিজের গানের একটা সিডি করতে চান, আমি ব্যবস্থা করে দেব কিনা। আজ পর্যন্ত সেই সিডি হয়নি বলাই বাহুল্য। অন্তত আমার তত্ত্বাবধানে হয়নি। আর জনৈক 'দেব'ও আমাকে কোনোদিনই বলে যাননি তাঁর আসার খবর রাধেশ্যামকে জানাতে। ফলে এই কথোপকথনেরও পুনরাবৃত্তি বছরের পর বছর ধরে চলছে।

দেখা যাচ্ছে সাউন্ডম্যান চাইলেও তত্ত্ব আলোচনা অতএব সম্ভব নয়। সাউন্ডম্যানকে দেখলে সাধুগুরুদের সিডির দিকে মন, আর সাউন্ডম্যানের তাঁদের গানের কারিগরি খুঁটিনাটির দিকে নজর।

পুনরাবর্তনের একটা নেশা আছে। মেলায় একই গান যেমন আমি বছবার শুনেছি একই শিল্পীর কণ্ঠে, আবার একই গান অনেক শিল্পীর কণ্ঠেও অনেকবার শোনা হয়েছে। ডিসেম্বর মাস এলেই মনে একটা হালকা আতঙ্কের ভাব জাগে, আবার শুনে হবে এত এত গান, মিশ্র করতে হবে সিডির জন্য! তবু করে যাই ওই ধ্বনির পুনরাবর্তনের নেশাতেই সম্ভবত। আমাদের বিন্দিং-এর লোকেরা গানের ঠেলায় হয়ত অস্থির হয়ে পড়েন। মুখে কেউ কিছু বলেননি আজ অবধি যদিও। অরুপদা বলেছিল এই সময় নাকি বাড়িতে গানে দাঁত বসানোর কাজ চলে! সেটা কী জিনিস? যাঁরা লাইভ গান শোনেন তাঁরা হয়ত লক্ষ করে থাকবেন, প-বর্গের কোনো অক্ষর দিয়ে গঠিত শব্দ মাইকের সামনে উচ্চারণ করলে, মাইকের ডায়াফ্রামে মুখ-নিঃসৃত জোরালো বাতাস লেগে একধরনের শব্দ হয়। ইংরাজিতে যাকে বলে popping sound। অনেকটা ফোকলা মুখে কথা বলার মতো, অনেকটা হাওয়া বেরিয়ে আসে যেন। সিডির জন্য গান মিশ্র দিয়েছিল 'গানে দাঁত বসানো।' আমার কাজের ঘরের দরজায় বোর্ড বসানোর প্রস্তাব দিয়েছিল, এই বিজ্ঞাপন দিয়ে যে, 'গানে দাঁত বসাইয়া থাকি!'

লাইভ সাউন্ডের কথা প্রসঙ্গে বলা দরকার যে, আমরা মেলায় যতটা সম্ভব ন্যাচারাল একটা অ্যাটমস্ফিয়ার তৈরি করার চেষ্টা করি প্যাভেলের মধ্যে। অর্থাৎ মাইক ছাড়া সামনে বসে গান শুনলে যেমন শুনতে লাগবে, মাইক দিয়েও যেন অনেকটা সেইরকম লাগে। বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড প্রসেসিং যতটা সম্ভব কম করার চেষ্টা করি। আমরা বেশি reverb ব্যবহার করি না। গলায় অহেতুক delay দিয়ে গলাটাকে প্রচুর ভাসিয়ে দিই না। বাউল গানে বাঁশি ও হারমোনিয়ামের যে অত্যাচার কিছুদিন যাবৎ শুরু হয়েছে, তা যতটা সম্ভব স্তিমিত করে পেশ করার চেষ্টা করি। সর্বোপরি আমরা কখনই খুব জোরে লাউডস্পিকার বাজাই না। মেলায় খেয়াল করলেই দেখবেন প্যাভেলের বাইরে থেকে গান প্রায় ঠিকমতো শোনাই যায় না। এইসব কারণে অনেক সময় শিল্পীদের বিরাগভাজনও হতে হয়। কারণ অন্য যে কোনো জায়গায় বাউল-ফকির গান বা অন্য কোনো লোকগান মানেই তারস্বরে লাউডস্পিকার, সাংঘাতিক জোরে বাঁশি ও গলায় প্রবল reverb ও delay-এই আবহটার সঙ্গে শিল্পীরা পরিচিত। তাঁরা এই সাউন্ডটা কানে না পেলে অনেক সময় ভাবেন, তাঁদের গান শ্রোতাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছচ্ছে না। আমরা নিজেরা অনেক শুনে শুনে এমন একটা সিদ্ধান্তে ক্রমশ পৌঁছছি যে এই ধরনের ন্যাচারাল সাউন্ড প্যাভেলের ভিতর তৈরি করা গেলে অনেকক্ষণ ধরে শুনতে আরাম লাগে। প্রচণ্ড জোরে শুনলে কান শরীর সব সহজেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যেখানে দু'দিন ধরে গানের উৎসব সেখানে এমন সাউন্ডই আরামদায়ক।

এই ন্যাচারাল শব্দটা লিখতে গিয়ে একজনের কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আমাদের Natural Chemical তত্ত্বের প্রবক্তা সর্বজনপ্রিয় প্রয়াত গৌরখ্যাপা। মনে আছে একবার স্টেজে গান গাইতে উঠে গৌর তাঁর খমকের কাঠিটা দিয়ে হঠাৎ হঠাৎ মাইকে মেরে প্রবল জোরে খটাশ খটাশ করে আওয়াজ করছিলেন। দর্শকদের তো খুব আনন্দ। কয়েকবার হবার পর আমরা বুঝে ফেললাম এটা একটা ছন্দে হচ্ছে। তখন আমরা সেই তালে তালে মাইকটা মিউট করে দিতে থাকলাম। গৌর প্রবল বুদ্ধিমান ও যৎপরনাস্তি ফিচেল একজন মানুষ ছিলেন। আমাদের ব্যাপারটা আঁচ করে উনি তখন আওয়াজটা বেতালে করতে থাকলেন। আমরা আর কী করব, হাল ছেড়ে, মাইকটা যেন মরে না যায় এই প্রার্থনা করতে থাকলাম।

আমাদের মেলায় যেহেতু গিটার, কী-বোর্ড জাতীয় কোনো ইন্সট্রুমেন্ট থাকে না, তাই এই ধরনের ইন্সট্রুমেন্ট থেকে output নেবার ব্যবস্থাও থাকে না

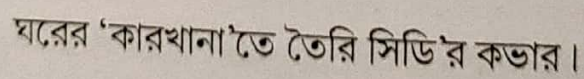
বেশিরভাগ সময়। বাউল ফকিররাও এই বিষয়টা জানেন বলে কেউ কী-বোর্ড নিয়েও আসেন না। এই নিয়ে তো একবার লেগে গেল পবন দাস বাউলের সঙ্গে। সেবার ওনার সঙ্গে গিটার বাজাবেন বলে একজন তো এসেছেন বিদেশ থেকে। এদিকে আমাদের কাছে গিটার থেকে output নেবার কোনো উপায় নেই। তারপর পবন দাসের দোতারাতেও preamplifier লাগানো। উনি এক ধরনের সাউন্ডের কথা ভেবেই নিশ্চয় সেই দোতারা ব্যবহার করতে চাইছেন। এদিকে আমাদের এখানে তো গিটার, দোতারা সব মাইকের সামনে বাজাতে হবে। এইসব যন্ত্রের সরাসরি output আমাদের মিক্সারে নেবার মতো ব্যবস্থা করা নেই। সেই নিয়ে উনি খুবই ক্ষুণ্ণ হলেন এবং ওনার দৃঢ় ধারণা হল শক্তিগড়ের মেলার সাউন্ড খুবই খারাপ। তারপর থেকে যতবার গান করেন, স্টেজে উঠেই বলেন, এখানকার সাউন্ড তো খুবই খারাপ, তবু দু'একখান গান গাইছি ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে সাউন্ডম্যানের পথ খুব বন্ধুর না হলেও একেবারে নিটোলও নয়। নিরাশার ভগ্ন সেতুও সেখানে বর্তমান।

এই ভগ্ন থেকে আবার সম্পূর্ণ অন্য এক ভাঙার কথা মনে পড়ে গেল। কোন বছরে ঘটল ঘটনাটা? ২০১০, ২০১১ নাকি ২০১২? ঠিক মনে পড়ছে না। এটা মনে আছে সেবার মধ্যপ্রদেশ থেকে প্রহ্লাদ সিং টিপানিয়া এসেছিলেন মেলায় গাইতে। মেলার দু'দিনই আকাশের মুখ ভার। টিপটাপ বৃষ্টি হচ্ছে। প্রথম দিন খানিকটা বৃষ্টি হয়ে প্যাভেলের মাথায় জল জমল। লাঠি দিয়ে খুঁটিয়ে সেই জল ফেলে, প্যাভেলের ভিতরের খড়ের আস্তরণ ওলটপালট করে, বালি ফেলে কোনোরকমে বসার যোগ্য করা গেল। দ্বিতীয় দিন রাতে, গান তখন বেশ জমে উঠেছে, শুরু হল প্রবল বর্ষণ। আমাদের তো মাথায় হাত। চারপাশে যত্রতত্র ইলেকট্রিকের তার, তেমন পোক্ত ওয়্যারিংও নয়। তারপরে সাউন্ডের অতশত যন্ত্রপাতি, আমার কম্পিউটার সব চলছে। এদিকে বাইরে বর্ষণ বাড়ছে, আর আমাদের মাথার উপর প্যাভেলের ছাতও ক্রমশ ঝুলে পড়ছে জলের ভারে। দু'এক জায়গায় ফুটো হয়ে জল পড়াও শুরু হয়ে গেছে। স্টেজে ওদিকে গান চলছে উন্মত্ত। বার বার থামতে বলা সত্ত্বেও গায়করা গান গেয়েই চলেছেন। জনতাও গানের নেশায় খেয়াল করছে না বাইরে কী পরিস্থিতি। এমন সময় জলের ভারে প্যাভেল আমাদের মাথার উপরে নেমে আসতে শুরু করল। আমরা কোনোরকমে সব যন্ত্রপাতি সুইচ অফ করে হাতের কাছে যা ছিল তাই

দিয়ে সব কিছু চাপা দেবার চেষ্টা করছি। প্যাভেলও আস্তে আস্তে নেমে আসছে মাথার উপরে। ইলেকট্রিসিয়ানকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সবকিছুর পাওয়ার অফ করার জন্য। সে এক কেলেকারি কাণ্ড। অবশেষে আমাদের মাথার উপরের বাঁশ-টাশ হাত দিয়ে ঠেলে আটকে রাখার সম্মিলিত প্রয়াস ব্যর্থ করে, প্যাভেল ভেঙে পড়ল ছড়মুড় করে। আমরা তার তলা থেকে সম্পূর্ণ ভিজে যাওয়া কম্পিউটার, জল ঢুকে যাওয়া সাউন্ডকার্ড—সব খুলে মাঠের পিছনের নির্মীয়মান বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নিলাম। একে শীতকাল, তায় বৃষ্টিতে জামাকাপড় ভিজে—ওই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে অপেক্ষা করতে থাকলাম বৃষ্টি থামার। অনেক পরে ভোরের আলো ফুটলে বৃষ্টি একটু ধরে এল। বাড়িতে ফোন করে বলতে মৌসুমী একটা ট্যাক্সি ধরে নিয়ে এল, আর আমরা সব ভিজে যন্ত্রপাতি তাতে ডাঁই করে সকালবেলা বাড়ি ফিরলাম। আমার মনে তো দারুণ দুশ্চিন্তা। আমার সাধের কম্পিউটারে জল ঢুকেছে, সাউন্ডকার্ডটা ভেজা—এগুলো কি আর কোনোদিন চলবে? বাড়ি ফিরে সামনের ঘরে মাদুর পেতে সব যন্ত্রপাতি খুলে, তার ভিতরের হাড়-মাস বের করে ফেলে শুকোতে দিলাম। পাক্সা সাতদিন ধরে শুকিয়েছিলাম মনে আছে। এদিকে রাকেশের জ্বর, শান্তজিতের মনে হয় সর্দি। আমার কেন কী জানি কিছু হয়নি। যন্ত্রপাতি শুকোলে, কাদার দাগ মুছে সব জোড়া দিয়ে চালাতেই আবার সেই মায়ার খেলা, দেখি সব ব্যাটা ঠিকমতো চলছে। সেই কম্পিউটারে গত বছরও রেকর্ড হয়েছে। এ বছরও হবে আশা করি।

বলছিলাম না, যে যাই বলুন, একটা নাছোড় স্পিরিট কিন্তু আছে মেলাটার। সুতরাং সাউন্ডম্যান রেকর্ড করে যাবে, কিছু সাউন্ড ভালো হবে, কিছু খারাপ... কেউ রেগে যাবে, কেউ পছন্দ করবে... টানা কাজের মধ্যে কিরণদা এসে ঠোঙায় করে দুটো চপ দিয়ে যাবে..., এভাবেই হবে, এভাবেই হয়।



যোগ-শূন্য যোগ: A Festive Union of Separations

সাত্যকি ব্যানার্জি

বাউল ফকির উৎসব মেলার শনি রবি চলে যাওয়ার পর আসে সোমবারের ভাঙা মেলা অথবা এক্ষেত্রে না মেলার সকাল। মাঠের ঘাসে লেগে থাকা আবিরের দাগ, লাড্ডুর গুঁড়ো, পায়ে চাপা চটের ওপর ধুলোট খেলার চিহ্ন, গাঁদাফুল . . . এদিক ওদিক ক্লান্ত অবসন্ন কিছু মানুষ, দাঁতে মুখে হাতে আবির, মুখে রাতজাগার গন্ধ। আর একটা spectacle of waste. সাপ্তাহিক জঞ্জাল এসে জড়ো হয় মাঠ ঘিরে। After the fest comes the waste. অদ্ভুত এক symbolic দৃশ্যান্তর।

অমিত রায় বাউল ফকির উৎসবের প্রধান ও অন্যতম ডিজাইনার, (এই ফাঁকে বলে রাখি আমার মনে হয় এ মেলার সকল উদ্যোগী, যোগদাতা—সবাই-ই তাই। নির্বিকল্প ও অন-অপরিহার্য; indispensable but not inevitably indispensable), এই মেলার দশ বছর প্রসঙ্গে বলেছিল; ১ থেকে ৯ সব সংখ্যাই উৎসবের আগে যোগ হয়েছে, একবার শূন্যটাও যোগ হওয়া উচিত। এই অদৃশ্য যোগ, এই শূন্য যোগ, কিন্তু মেলার ক্রমান্বয়ে বারে বারেই থেকেছে। প্রত্যেক সংখ্যার আগে শূন্য যোগ থাকে, যেমন digital clock-এ ইউনিট বা একক সংখ্যার আগে দেখা যায়—00, 01, 02 . . .। এই শূন্যটাই মেলার অন্তরীণে বিপরীত ঘূমের মতো জড়িয়ে রাখে। যদিও ‘মেলা’ শব্দের মধ্যে মিলনের অর্থ বর্তমান, বর্তমান সমারোহ-সাধন, তবুও মেলার ভাবে মিলনের মধ্যে মাথুরও কি বর্তমান নয়? শ্রীকৃষ্ণর মথুরা যাবার পর শ্রীরাধার মাথুর বিচ্ছেদ ভাব সব মানুষের মিলন-বৃন্দাবন ক্ষেত্রের অন্তর্গত। মেলা এই মাথুরকেই বারে বারে ফিরে দেখার উৎসব আয়োজন। অথবা লালনের ‘দৈন্য গান’-এ ফরহাদ মজহার যাকে বলেছেন আপনারই অপরকে অপার থেকে ডাকার ভাব এই, সকল মিলন আয়োজনে বিপরীত রীতির মতো বর্তমান। এই দৈন্যের সাধনায় ও সম্মানেই বছর বছর ঘুরে আসে উৎসব-প্রয়োজন। প্রতি বছরই আসন্ন বছরের কিছু অভাবিত অনুপস্থিতিকে উৎসব-মুখর বিদায়-বরণ জানিয়ে রাখার অবলম্বন। সবসময়ই মনে হয় কাকে শেষবার দেখছি, শুনছি; পারমিতাদি শেষবার বসে পায়েস খাওয়াচ্ছে, বিকাশদা শেষবার ভাত বেড়ে দিচ্ছে, সুকান্তদা শেষবার রেকর্ড করছে। আলিসন, মালা, আবির, মিষ্টি, প্রণাম-বিদায়ের মিলন ধুলোট নাচ কার সাথে শেষবার, সতি

কেউ জানি না। এই মেলাতেই বছর ঘুরে খবর আসে কখনো ফটোয়, কখনো কাট-আউটে, কখনো রেকর্ডিং-এ, কখনো ফিল্ম-এ, কখনো টি-শার্ট-এ, পোস্টারে, ক্যালেন্ডারে—বছর ঘুরে অতীত মানুষের না-থাকা বর্তমানে উদ্ভাপিত হয়।

প্রথম বছর কালী দাশগুপ্তর ফটো-ফ্রেম গড়িয়াহাটের বাঁধাই-এর দোকান হয়ে খানিক রাস্তা উজিয়ে, ঢাকুরিয়া ব্রিজ, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য (বিপজ্জনক) সেতু হয়ে এল উৎসবের মঞ্চে। গৌরলীলার ভরা শনিবারের সন্ধ্যায় গুরু হল স্মরণোৎসব, না-থাকা অতীত-মানুষের ছায়া ফেলা বর্তমানে। এরকম আরো ছায়া ভরে যাবে বছরে বছরে। সনাতন দাসের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান এবং উৎসবের ইতিহাসে প্রথম গান যাদবপুরের সম্বর্ধনা। হরিনাম, গুরুনাম, আসর-বন্দনা-বিহীন বাউলের আসর? গৌর ক্ষাপার হুকার, 'এখন অজ্ঞানের আসর হচ্ছে'। তারপর গৌরচন্দ্র করল ক্ষাপা 'গৌর কল্পবৃক্ষমূলে বোস গা বা রে মন'। গৌরক্ষাপার হাতঘড়ি, খমক, ক্রুদ্ধ তর্জনীতে খমকের কাঠি, জ্বলজ্বলে চোখ যেন গিলে খেতে এসেছে এই মেলার হাটবাজারকে। খেয়েওছে, রেখেও গেছে ছন্নছাড়া উচ্ছিষ্টদের এধারে ওধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এ বৃক্ষমূলও থাকবে না, থাকল না। ন'বছর পরে উৎসব কমিটির স্টলের পাশে রাখা বিশাল cut-out, টি-শার্টে মুখ হয়ে বেড়িয়েছে মাঠময়। But liberty here, is not only a statue. না থেকেও থাকা শোকের ছায়া...

উৎসব কমিটির স্টলও ফাঁক হয়ে যাচ্ছে এক দুই করে। টেবিলের সামনের চেয়ারগুলো ফাঁকা দেখায় না, তবে শূন্যস্থানগুলো দেখতে পাওয়া যায়। মাথার ভিতর cut-outগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু কিছু opt-outও আছে। স্মৃতির শিয়রে উৎসবের স্টল, অফিস, জমাটখানা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। সব শূন্যতা প্রাকৃতিক নয়, তবে এখন মনে হয় স্বাভাবিক। দুঃখের, তবে শোকের নয়। থেকেও না-থাকা মেলার পরিযায়ী চরিত্রের মিলন-মাথুর নিয়তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। This festival like a vessel holds all the absences that emerge from a year of deaths and decays. A sense of ephemerality is there within and without. বিভিন্ন বিচ্ছেদ তার নতুন স্তর, নতুন পাত্র ঘুরে ঘুরে দেখায় মেলার মাঠে। মেলাকে তার আনুষ্ঠানিক পর্বে মনে হয় a fashion parade in the city of plague।

অমিতদার বানানো বাউল ফকির উৎসব নিয়ে শর্ট ফিল্ম-এর এক দৃশ্য শুরু হয় সকালের উৎসবের মাঠে। তারা পীঠ থেকে আসা অন্ধ কানাই দাস বাউলের গান শুট করা হচ্ছে, গান গাইছেন তিনি, 'এসে গৌরলীলার বাজারে, অবাক

যাই হেরে।' গান চলছে আত্মনিমগ্ন অনুযঙ্গে, গভীর এবং অবতল music-scape, বৈরাগীর মাধুর্য এবং রিক্ততায় পরিপূর্ণ। এদিকে দৃশ্যপট সকালের মেলার মাঠ, গৌরচন্দ্রের খড় ও চটের ওপর বসা গোল আসর, ছড়ানো-ছেটানো দর্শক, মাঠের লাগোয়া কোনো তিন তলা বাড়ির ছাদ থেকে দেখা বিকেলের ঘর-ফেরা পাখিরা, সন্ধ্যার মেলার মাঠ, জনবহুল উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য ও সরগরম, মাঠে গরম লুচি, জিলিপির ফুটন্ত কড়াই, বাচ্চারা এর ওর হাত থেকে খেলনা নিয়ে কাড়াকাড়িতে ব্যস্ত, বেলুন নিয়ে খেলছে। তলায় তলায় গভীর নির্জন পথ একা সওয়ারি একতারার গানকে নিয়ে চলেছে। Rejoicing the earthliness, circumventing death and oblivion. মেলার নিগূঢ় চরিত্র ওই লাউয়া বাদ্যের শব্দের মতো এক চিকন তার থেকে বেরিয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় খেলছে। 'হাওয়া বন্ধ হলে সুবাদ কিছুই নাই।' বেলুনগুলোর মতোই ভিতরে বাইরে হাওয়া ভরা, হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ছে এক চিলতে রবারের শরীর, এক টিপে ফেটে যাবে, অথবা গ্যাস বেলুন যেমন, একরঙা সুতো ছেড়ে দিলে অন্তরীক্ষে ভেসে যাবে, বদ হাওয়া লাগলে খাঁচায়, উড়ে যাবে।

কোনো হাওয়াই বদ নয়। হাওয়ার কাজ হাওয়া করে, খাঁচায় গিয়ে লাগে, পাখিকে তুলে নিয়ে যায় আরেক জায়গায়। এই খাঁচাগুলো সময়ের—ভ্রাম্যমান সদা পরিবর্তনশীল সময়ের। হাওয়া ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, গোলগুলো ঘিরে গোল গোল ঘোরে, তারপর উড়ে যায় অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। একটা caravanish চরিত্র আছে স্থানান্তর-রহিত এই উৎসবের। সময়ের বদলটাই চোখে পড়ে। মনে হয় যদি roughly ৩৬৫ দিন পরে না হয়ে ৩৬৫ মাইল পরে মেলা বসার রীতি থাকত, সেখানকার লোকজনের উদ্যোগে, এই যাযাবর চরিত্রের বৈচিত্র্যগুলো evident হয়ে পড়ত rather than travelling through the time. যে গোল থেকে মেলার জন্ম সেই গোল আর নেই, থাকেও না। যেমন মেলায় যে আড্ডাগুলো উঠে আসে/আসত, সেই আড্ডাগুলোও কি বন্ধ হয়ে/বদলে যায় না/যায়নি? যে গোলগুলো ঘিরে গৌরঙ্গ্যাপা, তিনকড়ি চক্রবর্তী অথবা রাজা চ্যাটার্জিদের ঘিরে শুধু আনন্দ, গান নয়, আরো স্পষ্ট, পৃথক কোনো উন্মাদনা, সঙ্গ, অনুসন্ধান—তা কী করে আর থাকে তাঁদের চলে যাবার পর? এই মৃত্যুগুলো ছাড়াও অনেক জীবন্ত দশা এক জীবনেই বারে বারে ঘুরে আসে, গোল-এর ইতিহাস নিয়ে। এই টানগুলোর আগে পিছে, মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরে, মানুষে মানুষে যোগাযোগ ও তা নিয়ে

যোগদান—এর ভিতরে এই আপাত অদৃশ্য স্তরবিন্যাসগুলোই মুখোমুখি হয় মেলার মাঠে। মেলাকে আদর করে খেলার অনুযঙ্গে ডাকা হয় এক যোগে। মেলাখেলা। যেন এক খেলাঘর; প্রত্যেক যোগাযোগ, সম্পর্ক, বন্ধুত্বের ঘরে তার আপাত অশেষ চেতনা নিয়ে বর্তমান:

গয়া গঙ্গা বারাণসী বৃন্দাবন
ঘোষপাড়া পেরো মক্কা মদিনে
যায় মানুষ মানুষ দরশনে

এই উৎসব তীর্থক্ষেত্র নয়। কোনো পরব-পার্বণ-তিথি-নক্ষত্র-বারব্রত যোগ এর মানচিত্রে নেইও, শুধু গান ছাড়া। আর কিছু ভাবতে হলে ওই ‘মানুষ মানুষ দরশন’ই ভাবতে হয়। মানুষের টানে, মানুষের সঙ্গে সঙ্গ লাভের আনন্দ নিতেই মানুষ আসে। সমকালীন নগরদর্পণ তার সমস্ত নশ্বরতা নিয়ে মুখোমুখি হয় এই মেলাখেলার মাঠে। আমাদের ritualistic exercise in profanity-র নিদর্শন থেকে যায় বছর বছর। After the fest there should be waste; that there is waste, there was a fest . . . মেলার খাঁচাটাই একমাত্র থেকে যায় বিনাশহীন হয়ে; শূন্যস্থান-কৃতস্থানের নতুন নতুন সমীকরণ তার ভিতরে স্থান করে নেয়। অবিনশ্বর সে।

সপ্তম বছর মেলার শেষে সিলেট থেকে আসা শিল্পী চন্দ্রাবতী রায় বর্মণ এবং অমরীষ দত্তের বিদায়ী ভোজে বর্ষীয়ান মাতৃময়ী শিল্পীর সম্মানে নিরামিষ খাওয়া হয়েছিল। গান গল্প অনুপানবিহীন আড্ডা চলাকালীন পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় (মেলার আরেক অন্যতম ও প্রধান উদ্যোগী, ও আমাদের মেলায় আগুন ধরার ভর যে প্রথম ধরিয়েছিল) বলেছিল, ‘এমন সাত্ত্বিক আহার-আনন্দ আপনার জন্যই সম্ভব হল মাসিমা।’ মৌসুমীদির বাড়িতে ঠাসা এক ঘরভর্তি বন্ধুবান্ধবের বড় দল-দঙ্গলে সত্যিই অভিনব এক wrap-up party-র সন্ধ্যা উপস্থিত হয়েছিল। এই সন্ধ্যা আসরে সে গলাগুলো একসাথে কথা গানের মাহল-মাহতুল বানিয়েছিল সেই টুকরোগুলো রয়ে রয়ে গেছে wind archive-এ। ঘরটা খেলা-মেলার মাঠের মতো একই রয়ে গেছে (নতুন চেয়ার টেবিল ছাড়া), কণ্ঠস্বরদল কেবল বদলেই নয়, ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে। মাসিমা কয়েকদিন আগেই চলে গেছেন, আরো সেই সন্ধ্যার বহু মুখ থেকেও চলে গেছে। চলে যেতে হয় হয়তো। যেমন মেলা দু দিনে অখণ্ড অনন্ত ভাব তৈরি করে, তারপরেই আসে জঞ্জালের সকাল।

সব বিচ্ছেদ পৌরাণিক নয়, সব চলে যাওয়া প্রাকৃতিক নয়। প্রথমবার উৎসবের রেকর্ডিং-এ শোনা গোড়ভাঙার ফকিরদের গাওয়া ‘মিলন হবে কতদিনে’—ওই কণ্ঠস্বরগুলো আর কি একসাথে শোনা যাবে? রেকর্ড করা যাবে? A more profane inquiry creeps in: সত্যিই তো, মিলন হবে কতদিনে? জানি না। কেউ যদি আঙুল তুলে ‘I accuse’ বলে, আর কেউ যদি সাহস করে বলে, ‘কাকে?’, তখন দুর্বল হয়ে যাবে তর্জনী। ঘাড় হেলে পড়বে। ‘কাউকে না।’ তবে এটা ঠিক যে, খুকির যক্ষ্মা হয়েছে, এবং তার সব দোষই তার একান্ত নিজস্ব vulnerability নয়।

কিছু কিছু বিচ্ছেদ legendary, কিছু চলে যাওয়া-আসা ঐতিহাসিক, যা মেলার সাথে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত না হলেও সম্পর্ক কিছু থাকে। এত লোকের মাঝে এই বিচ্ছেদ-দল যেন প্রতিবার rechristened হয় এই মধ্যে, এত লোক, এত আয়োজন সমারোহে। মহীরুহের মতন এক একটা গান জেগে ওঠে উল্লাসে, হর্ষে, বিষাদে। চার বছর আগে সিলেট থেকে আসা শিল্পী রণেশ ঠাকুরের গান ‘সুরধুনীর কিনারায় সোনার নুপুর রাস্তা পায়ে, নব নাগরী গো, সুন্দর গৌরাজ রায়’ আবহমান এক দৃশ্য এক ‘সময়ের দেশের’ কথা বলে, যে দেশ থেকে বিচ্ছেদ সংগঠিত হবার নয়, বা হয়েই আছে সবসময়। মাঝে এরকম মেলা ‘মানুষ মানুষ দরশনে’র আয়োজনের সমান আট মিনিটের গৌরচন্দ্র সেই দেশ উপস্থিত করে মেলার মাঠে, যে দেশ হারিয়ে গেছে, অথবা সবসময়ই আছে। An everpresent, everlost nation. গানের text-এ খেয়াল করার মতন tense-এর ব্যবহার, যেন চোখে দেখা যাচ্ছে, ‘সুন্দর কপালে, সুন্দর তিলক, সুন্দর একখান নামাবলী গায়ে’; যেন কানে শোনা যাচ্ছে, ‘যখন গৌরায় গান করে, নদীয়াবাসীর ঘরে ঘরে, মধুর সুরে ভুবন লুটায়’। পদকর্তা এবং গায়ক শিল্পী এখানে মূর্তিকারের মতো তখনই গানে গানে মাটির তাল ঘটছে, রূপ আকৃতি সহ সচল বিগ্রহ গড়ছে। উল্লসিত শ্রোতা দর্শক যে যার মতো দেখছে শুনছে, এই মূর্তি ঘিরে নাচছে।

ফরহাদ মজহার তাঁর ‘বাউল ফকিরের দৈন্য গান’ প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ‘সাধক টের পায় যে, যে অধরাকে ভাষায় ধরতে চাইছে, এবং যাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে বলে কখনো কখনো তার মায়াজ্রমও হয়, সেই অধরা সবসময়ই ভাষায় অনুপস্থিত থাকে। সে আছে অথচ নেই। ভাষার অর্থ আছে, কিন্তু চিহ্নব্যবস্থা হিসেবে ভাষার বৈশিষ্ট্য এমনই যে প্রতিটি পাঠই নতুন অর্থ তৈরি করে। প্রতিটি নতুন পরিস্থিতিতে ভাষার নতুন অর্থ তৈরি হয়। যে অর্থ

আছে বলে ধরে নেওয়া হয়, সেই অর্থ একই সঙ্গে আসলে নেইও বাটে। এই অনুপস্থিতি ভাষার আন্তরিক বৈশিষ্ট্য। অথচ এই অনুপস্থিতিই সাধককে চির বিরহী করে রাখে।' এই সাধক পদকর্তা, এই সাধক গায়ক শিল্পীও। রণেশ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর এই বিষাদময় অনুপস্থিতি ধরে রেখেছে otherwise আনন্দময় text এবং আসরের context-এ।

আবার ঐতিহাসিকভাবে দেখলে সিলেট শ্রী গৌরাঙ্গের মাতুলালয় এবং বাংলার মধ্যযুগীয় নব সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব তথা ভক্তি চর্চার অঙ্কুরময় অন্যতম সংস্কারভূমি। নদীয়া, নবদ্বীপের সাথে সিলেটের প্রাক-আধুনিক যোগাযোগ এই গানে গায়কদলের সাথে বিষাদময় অনুপস্থিতির আর এক যোগাযোগ নির্মাণ করে। বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আসা শিল্পীর কণ্ঠে এই গান এক নতুন সমকালীন ঐতিহাসিক মাত্রা of separation আনে সন্দেহ নেই। তবু performance-এর মধ্যে এই বিচ্ছেদ বিষাদ হর্ব উল্লাস সমারোহ শব্দ ধ্বনি চিত্র তৈরি করে, শিল্পী দর্শক, শ্রোতাদের মধ্যে an ecstasy of communion তৈরি করে। The reflection of pain is communicated through its exultation, as if the eternal land and legend is lived through the rejoice-song-communion. মেলা উৎসবের আসরে এত হাততালি-স্টেজ-এর মাইক্রোফোনগুলোও নীরব থাকতে পারেনি। তারই কান থেকে শোনা যায় উৎসবের 'ওপারের গান' অ্যালবাম-এ। But the words, the song, the festival — everything is ephemeral and elusive... waste will cover up the space of the fest... that there is waste, there was a feast; that there was a fest there is waste...

আর এক দৃশ্য রঞ্জিত গৌসাই, নদীয়ার এপারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে আসা শিল্পীর, গত বছরের দুপুরবেলার বিজয় সরকারের গান 'ও আমার দেশের মাটি শেষের প্রণাম লহ'।

কবিরাজ বিজয় সরকারের ওপার ছেড়ে আসার সময় লেখা গান। গৌসাই ও তাঁর মধ্যে উপস্থিত সেদিনকার শিল্পীবৃন্দও বেশিদিন হয়নি ওপার ছেড়ে এসেছেন। এ গানের দ্বিতীয় স্তবক থেকেই চোখের জল আর রাখতে পারলেন না তাঁরা, গান আরো কিছু দূর এগোনোর পর হঠাৎ পিছনে ডুকরে উঠল কান্নার শব্দ। আমারই পিছনে বসা স্যুট-দুরন্ত ভদ্রলোক ও তাঁর স্ত্রী বা সঙ্গিনী, হয়তো আশেপাশেই... মনে পড়ল এই মাঠ, পাড়াপড়শি ঘিরে যাঁরা থাকেন, নিকট, অনিকট দূরত্বে যাঁরা এসেছিলেন, এককালে কলোনি স্থাপন করেছিলেন, সবাইই

তো ওপার ছেড়ে আসা। এই পাড়াতেই ‘মেঘে ঢাকা তারা’র গুটিং হয়েছিল—কলোনি স্কুলের দৃশ্য; এই পাড়াতেই গল্প শুনেছি কখনো কোনো আড্ডায় ছোট ছোট বাচ্চারা এক আধ-পাগল লোককে ‘রাজাকার রাজাকার’ বলে খেপিয়ে বেড়াত; এই মাঠেই 7th year প্রথম রাতে ঝড়বৃষ্টিতে প্যাভেল ছিঁড়ে যখন রবিবারের অনুষ্ঠান বন্ধ হবার উপক্রম, পাড়ার লোকেরা একদিনে অসাধ্য সাধন করে প্যাভেল, দর্শক শ্রোতার বসার জায়গা, মঞ্চ দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। উৎপলদা, আমাদের মেলার আর এক অন্যতম প্রধান উদ্যোগী, বলেছিল, কলোনি বুড়ো হাড়েও খেল দেখিয়ে দিল। এই গান, এই কান্নার দুপুররোদে এই কলোনির কোমল গান্ধার দেখতে পেলাম। A colony in Separation. পুরো স্পেসটাই তো uprooted, চারিদিকে ফেলে আসার, ছেড়ে আসার স্মৃতি—পরিবারে পরিবারে, অদৃশ্য অ্যালবামে, এক প্রজন্ম-দুই প্রজন্ম ছাড়িয়েও। এই sense of loss হয়তো রোজকার জমা কিন্তু একদিনের গানে ‘লেগে যায়’। (কী অদ্ভুত এই লেগে যাওয়া কথাটা! এক বন্ধু বলেছিল, এইসি লাগি লগন মীরা হো গয়ি মগন—সেই divine লগন, আবার not too sacred. All the daily pain-inflicting profanities cut and hurt. লেগে যায়। যন্ত্রণাময়।) মানুষকে কাঁদায়, একমাত্র যা নেই তা নিয়ে ভাবায় যা আছে তার সামনে বসে, পৃথক আর এক স্পষ্ট জগৎ left in time।

গোঁসাই গানের শেষে অঝোরে কাঁদছেন আর বলছেন—আমি যদি ঠিক শুনে থাকি কারণ কোনো অস্পষ্ট কারণে আমারও দেখা শোনার ক্ষমতা তখন অস্পষ্ট—‘বাবা, কবে আমি বিজয় হব? কবে আমি সন্ন্যাস নেব?’ কোন দেশের মাটিকে শেষ প্রণাম জানাচ্ছেন গোঁসাই? কোন দেশে যাবে দেশের মানুষ? কোন দেশে থাকবে না? কেন কাঁদছেন গোঁসাই—ছেড়ে যেতে পারছেন না বলে? ছেড়ে যেতে হবে না বলে? কোন দেশ না চেয়েও ছেড়ে আসতে হয়? কোন দেশে না গিয়েও যেতে চায় মন? এই Dilemma of Resolution-এর মধ্যবর্তী গানের প্রেমময় অন্ধুর শিল্পী-দর্শক-শ্রোতাকে কাঁদায়, যেমন পদকর্তাকে কাঁদিয়েছিল লেখার সময়। এই emotive communion মেলা উৎসবের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়, স্বীকৃতি পায় ঘরে ফেরার গান, এত ফেলে-আসা-ঘর-ঘিরে-থাকা শক্তিগড়-নবনগরের মাঠে। আরেকটা কথা এই প্রসঙ্গে আমার, একান্ত আমারই মনে হয় যে, বাংলার রাজনৈতিক ভূগোলার সীমান্তবর্তী চরিত্র, এখানকার মেলা-মোছব, সাধুসঙ্গ, যাওয়া-আসা, যাত্রা-ধুলোটখেলার ক্ষণস্থায়িত্বকে সমকালীন ইতিহাসে এক বিরল চরিত্র দেয়।

এইসব নানা ক্ষণস্থায়িত্ব এই দুদিনের elusive continuityতে যেন body and soul মাইল যায়। মদ ও পাত্রের রং এক হয়ে যায়। পারস্য ভাষায় চশমা শব্দ যেমন 'চশম', মানে দৃষ্টি, আর 'হ' অর্থে দৃষ্টির ধারক। চশমা মানে দৃষ্টি ও দৃষ্টির ধারক দুইই। The thing beheld and the beholder become mystically one. নানা বিচ্ছেদ এই মিলনমেলায় শরীর ধারণ করে, একুনি মেলাবে বলে মেলায়। গোঁসাই-এর মতো আরো কত লোক আছে যারা একেবারে চলেই এসেছে, যেমন এসেছিলেন শুনেছি সুবল গোঁসাই হঠাৎ একদিন বাড়িঘর ছেড়ে, কিছু ফেলে আসতে হয়নি জোর করে। নিরুদ্দেশ ভ্রমণের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিলেন বৈরাগীর মন নিয়ে, ঘুরতে ঘুরতে গেছেন কোনখানে। তবে, কিছুই ফেলে আসে না, কিছুই নিয়ে আসে না মানুষ, তা হতে পারে না। কী ফেলে এসেছিলেন গোঁসাইজীই তা জানতেন, কী নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ভাষা, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর style of singing, apparent idiosyncrasies of utterance, diction, accentuated accents, the scan of the text he is singing, the rhyme he is interpreting সীমান্তরক্ষীদের অজান্তে বা মাল সমেত এসে পড়েছে এপারে লোকটার সাথেই। রুচির যোশীর ডকুমেন্টারিতে গাওয়া তাঁর গান, 'আমার কে করিবে লালন পালন, কে করিবে সান্ত্বনা/ জনমদুখী কপালপোড়া গুরু আমি একজন' কোন লালনের দৈন্যে গাওয়া? কোন ছেড়ে-আসা তাঁকে কপাল-পোড়া করল? কোন উচ্ছ্বাস তাঁকে 'দুঃখে দুঃখে জনম গেল' পংক্তিটাকেই তাল ফেরত করে গাওয়াল? ক্যামেরার সামনে দুঃখের উচ্ছ্বাস ফেটে পড়ল, তার আগে পরে কত দেশ বিদেশ, সাধুসঙ্গ, মেলা-মোচ্ছব, programme, shooting, ভক্তের বাড়ি, বাবুদের বাড়ি করে বাড়ুর T.B. Hospital-এর বেড, আড়ংঘাটার আশ্রম, সমাধিস্থ মাটির কোন তলায়? হাসপিটালের বেড-এ বলেছিলেন গোঁসাই, 'এবার ছুটি পেলে ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরে বিড়ি তামাক সব জন্মের মতো বন্ধ।'

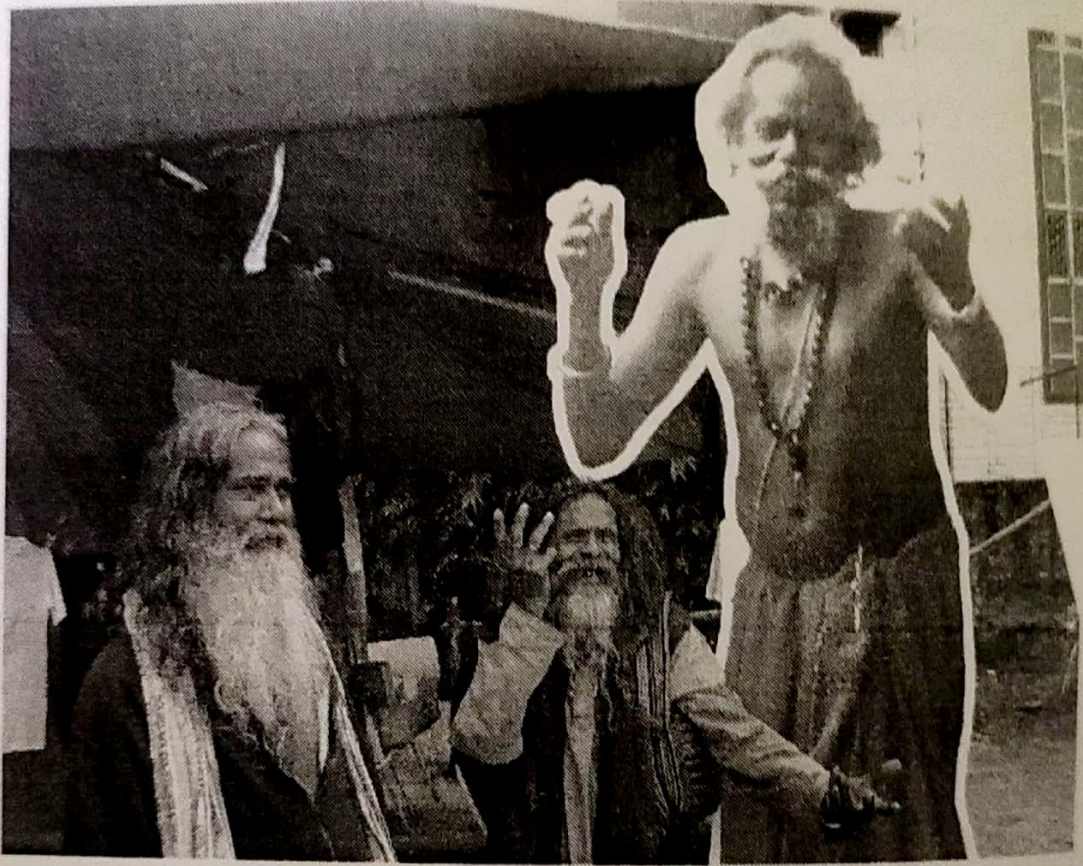
আরেক দৃশ্য গৌরক্ষ্যাপার Titan Sonata ঘড়ি। অরূপদা, আমাদের মেলার আরেক অন্যতম, প্রধান উদ্যোগী, সারিয়ে নতুন করে পাঠানোর পরে নীচু বাঁধগড়ার ভিড় রাস্তায় ক্ষ্যাপা 'ওরে আমার সোনাটা, ওরে আমার সোনাটা' বলে কুটপুটি আনন্দে, ছুটে ভেসে বেড়াচ্ছে, বাচ্চা খেলনা ফেরত পেয়েছে যেন নতুন করে। শেষবার মেলায় এসে বলেছিলেন, রাম খাবেন না, ওই রংটা কেমন জানি লাগে, ভদকা সাদা সাদা, সেই-ই ভালো। ক্ষ্যাপার বিরল অনামনস্ক শান্ত দৃষ্টিটা দেখতে পাই মাঝে মাঝে। সুবল গোঁসাইয়ের আশা-আনন্দে মেশা কান্না-দলা-পাকানো গলা শুনি। কী দেখেছিল ক্ষ্যাপা রাম-এর রং-এ? কী রং

এড়াতে চাইছিল ক্ষাপা? গৌসাই কী বন্ধ করতে চাইছিলেন, আবার কবে ধরার আশায় কী ছাড়তে চাইছিলেন? এক বন্ধু বলল, অনেক কথা হয়তো, মনে করিয়ে দিল, মনে 'লাগিয়ে দিল' দৃশ্য—মেলা ছেড়ে আসার সময় কান্না আসে, সব জানা চেনা মেলা বসে মেলা ছেড়ে যায়, তবু মেলা ছেড়ে গেলে দল বেঁধে খুলো মাটির রাস্তায় কান্না আসে। এই উৎসব ছেড়ে যায় সোমবার সকালে, সারা সপ্তাহের জঞ্জাল আসে, জঞ্জালের পাহাড় নামে মাঠ ঘিরে। মৌসুমীদিকে বলেছিলাম phenomenaটার কথা, after the fest comes the waste. তখনো জানি না লেখাটা লিখব। মৌসুমীদি বলেছিল, probably কোনো অজ্ঞাত কারণে মনে থেকে যাওয়া কবিতা:

The past life has died. I exult over its death,
because from this I know that it once existed. The
dead life has decayed. I exult over its decay
because from this I know that it has not been
empty.

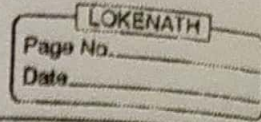
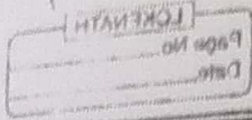
From the clay of life abandoned on the ground
grow no lofty trees, only wild grass. For that I am
to blame . . .

(Lu Hsun, Foreword to *Wild Grass*)



‘গৌর কল্পবৃক্ষমূলে বোস গা যা রে মন’। ছবি: অমিত রায়, মেলা ২০১৪।

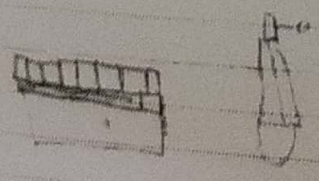
বড় হলাম এই মেলায়



৬.১২.১৭

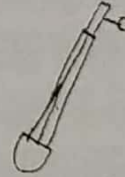
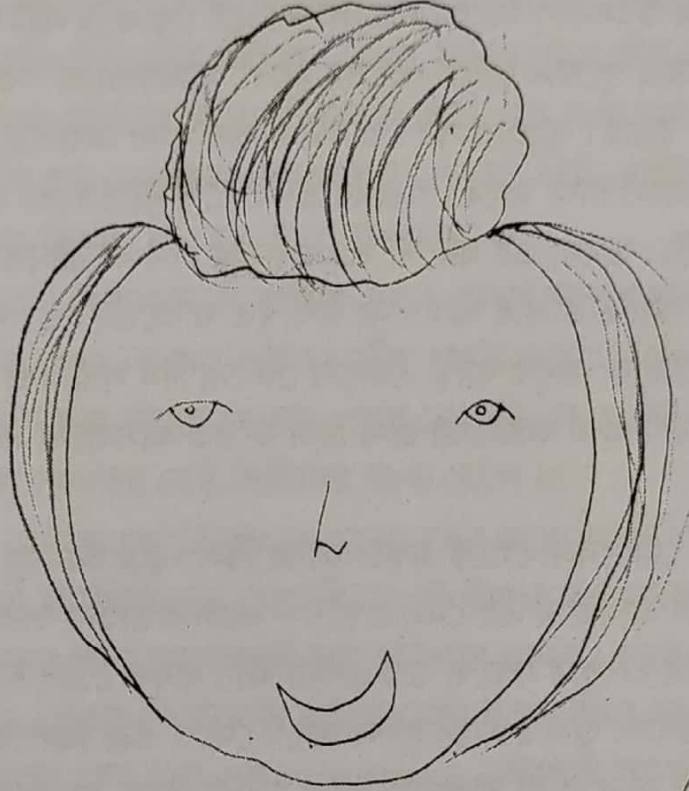
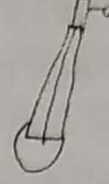
কয়ক বছর আগের কথা। একটা উৎসবের
 নাম ছিল বার্ডল ফকির উৎসব। সেই
 আনন্টা গান হতো সারি সারিলোখ ডান্ডে
 হতো, সেই আনন্টা খাবারের দোকান ছিল
 খেলনা বিকরি হতো দোকানরা বিকরি
 হতো। শেষ বছর মিটিঙে বোলল বাড়ি
 ফাটানো হবে আর বোলল
 ডডোডোহাড আর ডোহাডের লড়াই
 হবে।

সেই আনন্টা একটা বার্ডলের নাম ছিল
 কারতিকা দাস বার্ডল সে এক দিন
 বিগবয়ে গেলো। তার পর আবার
 তিন বছর পরে কারতিকা দাস বার্ডল
 গান গাওতে শুরু করল।
 বার্ডল ফকির উৎসব মোক্ষা বিকরি
 হতো, মোক্ষা বিকরি হতো।





হাউল



মিতির বয়স সাড়ে ছয়। মায়ের নাম স্নোতা, বাবা মানস।

নিরসার কথা

ঠিক কোন সালের কোনদিন থেকে, কিসের জন্য, কোথায়—এইসব তথ্য লিখে, শূন্যতাপূর্ণ করব না। আমি, তিতলি, তুয়া বেশ ছোটো ছিলাম। অগ্নি আরো ছোটো ছিল। সেই বয়সের একক অনুভূতিগুলো আমার সাথে থেকে গেছে। বাউল ফকির উৎসবকে ঘিরে সেগুলো জড়িয়ে থেকেছে আমার স্মৃতির তারের জঙ্গলে। পাড়ার পুজোর চাঁদার বইয়ের মতো অনেকগুলো ‘বিল বই’ থাকত সংগঠকদের কাছে। পুজোর পর থেকেই বাড়ির নানা জায়গায়, টেবিল-চেয়ারে দেখতাম সেগুলি রাখা আছে। অক্টোবরের শেষে, নভেম্বরের শুরু থেকে কমিটির মিটিং। তখন, ওই বয়সে, পড়াশোনার চাপ কী জানতামই না। নিয়ম করে প্রতিটি মিটিং-এ তাই আমাদের উপস্থিত থাকতেই হত। খুব মজা, বেশির ভাগ দিনই উৎপল কাকুর বাড়ি, কোনো কোনো দিন পারমিতা পিসির বাড়ি। বাউল-ফকির উৎসব আমাদের জন্য ছিল কয়েক-মাসব্যাপী এক আনন্দের আয়োজন।

বাড়িতে ছোটবেলা থেকে একটা আবহ ছিল। হারাধনকাকু নিয়মিত বাড়িতে আসত। যেটা আমাদের এই মেলার প্রাণ—বাংলার বাউল ফকিরদের গান, তাঁদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাই একটা ক্ষীণ ধারণা তৈরি হয়েছিল। জানুয়ারি মাসে, মূল উৎসব শুরু হওয়ার দুদিন আগে থেকে ওঁরা আসতে শুরু করতেন। ওঁদের থাকার জন্য মেলা প্রাঙ্গণের পাশে, ‘মলয় সংঘ’ ক্লাবঘরে, পুজো মণ্ডপে, বাঁশ, কাপড়, ত্রিপল দিয়ে ঘিরে, মাটিতে খড় বিছিয়ে, কঞ্চল পেতে সাময়িক থাকার ব্যবস্থা করা হতো। আমরা সেখানে ঢুকে, শিল্পী আর তাঁদের বাদ্য-যন্ত্রের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকতাম। কথাও বলতাম। তাঁদের স্বভাব-হেঁয়ালি কথোপকথন বাংলা-ভাষার একটা অজানা, লুকনো দিক উন্মোচিত করত সেই কদিন। তখন অত কিছু অবশ্য বুঝতাম না, শুধু দেখতাম কেউ কেউ আপন মনে মগ্ন, চুপ। অনেকেই আসতেন এঁদের কাছে, বেশ একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপের সেতু তৈরি করার চেষ্টা করতেন। বাউল ফকিররা কাউকেই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতেন না, আবার ভাব জমানোয় সবাই খুব একটা সুবিধাও করতে পারতেন না। দেখতাম, মুখে একটা হাসি ঝুলিয়ে বসে আছেন শিল্পীরা। সঙ্কেয় মেলা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতো। রাত গড়াত, গান উঠত জমে, আমরা ছোটোরা জানতাম এই দুদিন কেউ পড়তে বসতে বলবে না, রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমোতে যেতেও হবে না।

শুরুর দিকে, কোনো এক বছরে উৎসব শুরুর আগের একটা রাতের স্মৃতি খুব স্পষ্ট হয়ে মনে জেগে আছে। প্যান্ডেলের ভেতরের মেঝেতে বসার জন্য খড় আনা হতো আঁটি বেঁধে। তার উপর আমরা খুব লাফালাফি করে দারুণ ছল্লোড় আর মজা করছিলাম। স্টেজের কাছে সাউন্ড সিস্টেম চেক করা চলছিল। পাণ্ডুদা, উৎপলকাকু, মা, পারমিতাপিসি—আরো কয়েকজন মিলে কতগুলো ছবি এঁকে ক্যানভাসগুলো প্যান্ডেলের কাপড়ে আঠা দিয়ে আটকাচ্ছিল। রাতদুপুর তখন। হঠাৎ শুনি তীব্র হুইসল। দৌড়ে বাইরে গিয়ে জীবনে প্রথমবার দেখলাম রোজ রাতে কোন লোকটা সাইকেলে করে এসে আওয়াজ করে পালিয়ে যায়। আমি স্বপ্ন-ঘুম-মাথা এক অবস্থায় শুনতে পাই। নাইটগার্ড! শুনশান রাত। কিন্তু আখড়া কি আর শুনশান থাকে?

রাতের বাতাসে উৎসব প্রাঙ্গণে আখড়া থেকে ভেসে আসত গান। বড়ো হয়ে বুঝেছি এইসব অগম-পথের সঙ্গীত। গৌণ ধর্মের ভাষা। দুদিন ধরে শহরের মধ্যে এই উৎসবে আমরা যাঁদের পেতাম, পরে জেনেছি যে ‘গভীর নির্জন পথে’ অনেকটা না গেলে সচরাচর সেই শিল্পীদের দেখা মেলে না।

উৎসব দুদিন। আমরা ছোটোরাও আমাদের মতন করে ‘সহজ ধারা সঙ্গ’ করতাম। যত বড়ো হয়েছি বুঝতে পেরেছি যে এই উৎসব আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। উৎসবের ধারা আসলে দুই ভাগে বিভক্ত থাকত। একটা মূল প্যান্ডেলের ভিতর, স্টেজে। আরেকটা বাইরে মেলা প্রাঙ্গণ ঘিরে আখড়াগুলোয়। ‘বাউল ফকির উৎসব’ যেন আর এক woodstock—অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে নয়। কত ছেলেমেয়ে আসত, তারা মূল প্যান্ডেলে ঢুকতও না। আমরা বিভিন্ন আখড়ায়, প্যান্ডেলে, মাঠে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। এরা সারাক্ষণ আখড়াতেই বসে থাকত, গিটার বাজাত, গাঁজা খেত। অনেকেই কলেজ পড়ুয়া, কমবয়সী। বাউল-ফকির উৎসব আসলে অনেক বাঁধ ভেঙে দিত, কিন্তু এরা শুধু যেন মুক্ত-নেশার দিকটাই ধরতে পারত। আমার মনে হয় ওরা বাউল-ফকিরদের গভীর জীবনবোধ, বিশ্বাস আর গৌণ ধর্মের প্রাসঙ্গিকতাটা ধরার চেষ্টাই করত না। মজা খোঁজার woodstock-এরই শরণ হতো এরা মনে মনে।

উৎসবের সঙ্গে কয়েকজন কাকু ছিল (এখনো আছে)। উৎসব আয়োজনের পিছনে তাদের পরিশ্রম, তাদের অবদান অনস্বীকার্য। হাড়ভাঙা খাটুনি বোধহয় লাঘব হয়ে যেত উৎসবের রান্তিরগুলোয়। আমরা হাসাহাসি করতাম। ‘জানিস তো অমুককাকু আখড়ায় পুরো গলা পর্যন্ত খেয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে’। ‘জানিস তো কী অবস্থা! একটু আগে তমুককাকু প্রচুর টেনে স্টেজে উঠে বাউলদের সাথে

নাচতে শুরু করে দিয়েছে দর্শকদের সামনেই!’ কত যে টুকরো টুকরো মজার মজার স্মৃতি রয়েছে। মনে পড়ে, গৌর খ্যাপা কীভাবে নিজের প্রখর বুদ্ধি, রহস্য আর খ্যাপামোর concoction দিয়ে একটা আবহ তৈরি করতেন নিজেকে ঘিরে। যে আখড়ায় উনি থাকতেন, সেখানে ভিড় জমে যেত এবং অন্য শিল্পীরা প্রকৃতই গৌণ হয়ে যেতেন। আবার অনেক সেলিব্রিটিও আসত, আমরা ছুটে যেতাম তাদের দেখতে। তারাও আবার কেউ কেউ নেশায় বুঁদ হয় নানান খেল দেখাত।

হরেক রকম মানুষ আসত উৎসবে, প্রথম থেকে হরেকরকম পোশাক চাপিয়ে। কয়েকজনের pseudo হাবভাব নিয়েও বেশ হাসাহাসি হতো। রোজ দেখা যায় না এমন পোশাক-আশাক দেখলেই আমরা একটু উত্তেজিত হয়ে পড়তাম। এই ছোটো উৎসব প্রাঙ্গণে এত ভিন্ন ধরন আর ধারণের সমাগম হতো প্রথম থেকেই, যা বলে শেষ করা যাবে না।

আমরা ছোটোরা ওই দুটো দিন, দুবেলা মলয় সংঘের ক্লাবঘরে পাশাপাশি বসে যেতাম পাত পেড়ে খেতে। বিকাশ কাকুর দুর্ধর্ষ রান্না জানুয়ারির শীতে বেশ relish করতাম। আর একটা গেস্ট হাউস তো পাশেই ছিল। উৎপলকাকুর বাড়ি। এই বাড়ির বাথরুম ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা এক সময়ে মেলার বহু দর্শকেরই হয়েছে। নিজের শোওয়ার ঘরটাও ছেড়ে দিত উৎপলকাকু উৎসবের জন্য। কী ছিল না ওই ঘরটা! কমিটির মিটিং রুম, শিল্পীদের থাকার জায়গা, নেশার ঠেক, আরেকটা আখড়া; রাতে ঘুমিয়ে পড়ার জন্য অব্যবহৃত দ্বার। আমরাও তিন চারজন অনেক সময় বেশি রাতের দিকে শুয়ে পড়তাম। হয়তো ঘরের একদিকে একজন বাউল ঘুমোচ্ছে। তাকে নিয়েও হাসাহাসি—‘দেখ, কেমন নাক ডাকছে’, ‘দেখ দেখ ভুঁড়িটা কেমন তালে তালে উঠছে নামছে’। এইসব যা তা! আট-ন’বছর পরেও মনে পড়ে। আবার কত স্মৃতি যেন অতল থেকে উঠে আসে না, পালকের মতো ভেসে ভেসে ঘুরতে থাকে মনের ভিতরে। এই রাতগুলোর স্মৃতি। ত্রিপলের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে আখড়ায় কী চলছে তা দেখার স্মৃতি। এইসব স্মৃতি তুলনায় যেন শৈশবের দুর্গাপূজোর বা মহালয়ার ভোরের আধোঘুমের সুখস্মৃতির মতো। দুর্গাপূজোর theme প্যাভিলে শহরের ঘরবাড়ির খোপে গ্রাম বা প্রাসাদের যেমন একটা অদ্ভুত ভ্রম বা মায়া তৈরি হয়, উৎসবের মধ্যে বাউল, ফকির, ফ্ল্যাটবাড়ির গায়ে লাগা আখড়া তেমনি মায়া তৈরি করত শৈশবের মনে। বাঁশ, কাপড়, খড়, ত্রিপলে গড়া প্যাভিল আর আখড়াগুলো উৎসবের দুদিন পর হাওয়ায় মিলিয়ে যেত। থাকত শুরু স্মৃতি। নদীর ভাঙনে যেমন গ্রাম হারিয়ে যায়, উৎসবের দু-তিন দিন

বাদে বাউল ফকিররা, তাঁদের সংগীতের দ্যুতি, তাঁদের জীবনচর্যার আভাস—সব তেমনি শহুরে মনের অতলে তলিয়ে যেত। থেকে যেত শুধু শিকড়ের টানটা।

শিল্পীরা অনেকেই ছিলেন রহস্যময়। সত্যানন্দদাস বাউলের সাধনসঙ্গিনী জাপানি। তাঁকে নিয়ে আমার কৌতূহলের শেষ ছিল না। বড়ো হয়েছি যত, মনের ভিতরের প্রশ্ন স্পষ্ট হয়েছে। ভেবেছি, নিজের সমাজ, জীবনধারা ত্যাগ করে আজ এই মানুষটা একজন বাউলের সঙ্গে থাকছেন, খাচ্ছেন, শুচ্ছেন, বাঁচছেন কিসের টানে? দু-তিন বছর আগে উৎসবে, কতদিনের জমে থাকা কৌতূহল নিয়ে নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করেছিলাম, কোথায় জন্ম তোমার? প্রশ্নটা তাঁর পছন্দ হয়নি। কিন্তু আমার এতদিনের কৌতূহলের উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর জন্ম মাথায়। মাথার দিকে আঙুল তাক করে দেখিয়ে বলেছিলেন। আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম কী করে এই হিরোশে বা হরিদাসী নিজের দেশ, সমাজ ছেড়ে এসেছেন, বাউলানি হয়ে বেঁচে আছেন। বাউলদের জন্মবৃত্তান্তের বিশ্বাসকে তিনি আপন করে নিয়েছেন। নিজের জন্মদাতাদের দেওয়া ধর্ম ও শিক্ষার কতটুকু তাঁর স্মৃতিতে রয়ে গেছে, জানি না। পরম আশ্চর্যের বিষয়, সুদূর জাপানের একটি মেয়ে কীভাবে প্রত্যন্ত গ্রাম বাংলার গৌণ ধর্মের বিশ্বাসে নিজের সোনার গৌরকে খুঁজে পেলেন!

অবাক লাগত ছোটোবেলায়। এখনো অবাক লাগে। দেখতাম অনেক বাউলদের দলে বাচ্চা মেয়ে থাকত। তারা সেই বাউলদের সন্তান নয়। তাদের কী গুরুত্ব বা কাজ তাও বুঝতাম না। কৌতূহল হতো। তখনো আকাশে শুধু একটা চাঁদই দেখতাম। অগ্নি যেমন, ও আমাদের থেকেও খানিকটা ছোটো। আমরা সবাই এই উৎসবের মধ্য দিয়ে ভিন্ন এক জীবন-বিশ্বাস, বাঁচার ধারা দেখে বড়ো হয়েছি। এই উৎসব আমাদের প্রভাবিত করেছেন। অগ্নি এখন একজন promising grafitti artist হয়ে উঠছে। শহরের দেওয়ালগুলোকে নিজের ভাষায় নিজের ছবিতে ভরে তুলছে। আর একজন তিতলি। ওর photography-র প্রতি একটা sensibility তৈরি হয়েছে। আমি কলকাতা, তার কংক্রিটের জঙ্গল, তার ময়লার vat-এ ভরা রূপটাকে নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরি করার চেষ্টা করেছি। আমরা কিন্তু আস্তে আস্তে আকাশে চারটে চাঁদ দেখতেও শিখেছি। বড়ো হয়ে ওঠার সময় বাউল ফকির উৎসব আমাদের তা শিখিয়েছে।

শক্তিগড়ের এই বাউল ফকির উৎসব শহরের মানুষের কাছে এই বাংলারই এক অবদমিত, লুক্কায়িত শ্রেণির শিল্পীদের ভাণহীনভাবে মেলে ধরেছে।

আমাদের কাছে একটু ঘোলাটে ব্যাপারটা। মুসলমান নামধারী ফকিররা সোনার
গৌরের কথা গাইছেন, নবির কথা বলছেন। সেই একই কথা আর সুর আবার
বাউলদের গানেও চলে আসছে, অথচ তাঁরা হিন্দু নামধারী। এত মিলের মধ্যে
শুধু এইটুকুই অমিল। কোনো অসুবিধে নেই। যে যার নিজের মতো করে চার
চাঁদ দেখো।

তিতলির কথা

যাদবপুর শক্তিগড়ের বাউল ফকির মেলা আমার কাছে বড়ই আপন একটি মেলা। মা-বাবার হাত ধরে যেমন আমি আজ এত বড় হলাম, তেমনি এই মেলার হাত ধরেও আমি পেরিয়ে এলাম নয়-নয়টা বছর। এবার আমাদের দশম উৎসব। এতগুলো বছরের আনন্দ-দুঃখ, হাসি-কান্না, খারাপ-ভালো নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমি আমার জীবনের অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি। কিন্তু এই দশ বছরে একমাত্র যার মধ্যে আমি কোনো পরিবর্তন দেখিনি, তা হলো আমার এবং আমাদের অতি প্রিয় এই বাউল ফকির উৎসব। এই উৎসবের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এবং একটি বছরের অনুষ্ঠান শেষে পরের বছরের অনুষ্ঠানের জন্য মানুষের যে অপেক্ষা, তা আজও অপরিবর্তিত। আর এমনটা দেখা যায় যে কোনো দেশের যে কোনো জাতির যে কোনো সমাজের বড় উৎসবের ক্ষেত্রে।

২০০৬ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এই উৎসবের জন্ম। তার জন্মের ইতিহাস কিছুটা শুনেছি বাবার মুখে। বাংলার মাটির গানগুলোকে নিয়ে এইরকম একটা উৎসব করা যেতে পারে এই আইডিয়াটা নাকি প্রথম এসেছিল উৎপলকাকুর মাথায়। উৎপলকাকু সবার মধ্যে শেয়ার করে নেয় ভাবনাটা আর তা সকলের মনকেই খুব নাড়া দেয়। শুরু হয় বাউল ফকির উৎসবের প্রস্তুতি। কোমর বেঁধে লেগে পড়ে সবাই। উৎসবের নানা দিকের নানা দায়িত্ব ভাগ করে নেয় সকলে। শুরু হয় মিটিং, চাঁদা তোলা। শিল্পীদের নিমন্ত্রণ, মঞ্চ তৈরি—সব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো একে একে সেরে ফেলা হয়। আমার মনে পড়ে, এই মেলার প্রথম বছরের প্রথম চাঁদা দিয়েছিল আমারই বন্ধু ছন্দক, যা আমি কোনোদিনও ভুলব না এবং যা আমার কাছে খুব গর্বের। যাই হোক, প্রস্তুতিপর্ব না হয় শেষ হলো, কিন্তু উৎসব সফল হবে কতটা? মানুষ কতটা ভালোবেসে নিতে পারবে এই উৎসবকে? কেমন ভিড় হবে? শুরু হতে থাকে চাপা উত্তেজনা। এসে যায় ২০০৬ জানুয়ারির সেই শীত-মুড়ি-দেওয়া শনিবার। সকাল পেরিয়ে দুপুর, বিকেল-সন্ধ্যা। বাবার মুখে শুনেছি, অন্ধকার হয়ে গেছে কিন্তু মাত্র গুটিকয় লোক জড়ো হয়েছে মাঠে। কোথায় ভিড়? কিন্তু ঘন্টাখানেকের মধ্যে প্রচুর শ্রোতার ভিড় হয়েছে প্যাডেলের ভিতর—তাই দেখে সবাই নাকি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দ্বিতীয় দিনেও প্রচুর লোক হয়েছিল। গান, গানের তালে তাল মিলিয়ে নাচ, খাওয়া-দাওয়া, দেদার আনন্দ, সব মিলিয়ে

উৎসব জমজমাট। প্রথম বছরেই খুব সফলতা পেল এই উৎসব।

শুরু হলো বাউল ফকির উৎসবের যাত্রা—চলেছে আজও একই ছন্দে। উৎসবের এই এতগুলো বছরের স্মৃতি হাতড়ালে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে যেমন অনেক আনন্দ, আবার বেশ কিছু দুঃখও। এই উৎসব আমকে পাইয়ে দিয়েছে ভুতু, বিরসা, ছন্দকের মতো দারুণ কিছু বন্ধুকে। উৎসবের প্রথম বছর থেকেই দেখে আসছি কার্তিক কাকুকে, যিনি আজ সেলিব্রিটি, দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়ান, ‘বিগবস’ করেন; চিনেছি সংগীতশিল্পী মৌসুমী আন্টিকে, যিনি উৎসবের পত্রিকা ‘আরশিনগর’-এর এ বছরের সম্পাদক এবং যাঁর আগ্রহে আমার এই লেখা (কোনো পত্রিকার জন্য লেখা আমার এই প্রথম)—এটি আমার চিরদিন মনে থাকবে। পেয়েছি সাত্যকিদের মতো একজন বড়ো মিউজিশিয়ানকে; পেয়েছি পাণ্ডুদা, সজীবদা, শিল্পীদিকে—যারা তাদের গান বাজনা দিয়ে সকলকে মাতিয়ে রাখতে পারে। তেমনি আমি উল্লেখ না করে পারব না আমার বাবা এবং বাবার কয়েকজন বন্ধুর কথা, যাদের অফুরন্ত ইচ্ছা, অদম্য উৎসাহ এবং রাত্রি-জাগা অক্লান্ত পরিশ্রমে বাউল ফকির উৎসবের একটা ছোট চারা গাছ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। মনে পড়ে অরুণাকাকুর কথা, যিনি বেশিরভাগ সময় উৎসবের স্টলের একটা চেয়ারে বসে বসে নানান রকম কাজ করতেন। অরুণাকাকুর মতো এই দশ বছরে আমরা হারিয়েছি এরকম কিছু উৎসবপ্রেমী এবং বেশ কয়েকজন গুণী শিল্পীকে। তাছাড়া শেষ দু-তিন বছর ধরে দেখছি কোনো কারণে উৎপলকাকু থাকে না, উৎসবের ঠিক দুদিন কোথায় যেন চলে যায়, যা আমার খুব খারাপ লাগে। এভাবেই কিছু পাতা ঝরে যাওয়া, কিছু নতুন পাতা গজানো, এই সব কিছু মিলিয়েই বাউল ফকির উৎসব আজ সকলের মুখে মুখে।

মনে পড়ে যাচ্ছে আমার ছোটবেলার কথা, উৎসবের আগের দিন অর্থাৎ শুক্রবার রাতে যখন উৎসবের মঞ্চ আমাদের সকলের মনের মতো করে সেজে উঠছে সারা রাত ধরে, একটু রাত হতেই কাজ থেকে ফেরা ক্লান্ত মা আমাকে নিয়ে বাড়ি চলে যেতে চাইত, কিন্তু আমি কিছুতেই যেতে চাইতাম না। আমার খুব ইচ্ছা করত সারা রাত জেগে সকলের সাথে আমিও মঞ্চ সাজাব। আমি চেষ্টা করতাম আমার ছোটো ছোটো হাত দিয়ে বাবাদের কাজে সাহায্য করতে। বিরসা ছিল আমার সঙ্গী। মায়ের কথা উঠতেই আর একটা কথা মনে পড়ল—বড় একটা দান-বাক্স হাতে নিয়ে প্যাণ্ডেলের ভিতর গিজগিজ করা ভিড়ে মায়ের টাকা তোলা, মা যখন হালকা বাক্স নিয়ে গিয়ে ভারী বাক্স ফেরত আনতো খুব

আনন্দ হতো, মনে হতো বাত্মের প্রতিটি টাকা পয়সায় মিশে আছে অজস্র মানুষের এই উৎসবের প্রতি ভালোবাসা।

আমার ছবি তোলায় প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ আছে। সেই ছবি তোলায় জন্য দরকার একটি বিষয়। আর অসংখ্য বাউল ফকির শিল্পী ও শত শত মানুষ মিলেমিশে একাকার হয় যেখানে, সেই 'বাউল ফকির উৎসব' আমার ছবি তোলায় একটি পরম প্রিয় বিষয়। যে বিষয়কে ক্যামেরা-বন্দি করার জন্য আমি সারা বছর অপেক্ষা করে থাকি।

এখন একটা কথা আমি সকলের সাথে ভাগ করে নিতে চাই। আমার বারেকারেই মনে হয় যে বাবা আর বাবার সব বন্ধুবান্ধব যারা এই উৎসবকে টেনে আসছে বছরের পর বছর, তাদেরও বয়স বাড়ছে, আর বয়স বাড়ার অর্থ ধীরে ধীরে কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। তাই আমার একান্ত ইচ্ছা, বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু কিছু দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে এই উৎসবের হাল ধরা। আমার বিশ্বাস আমরা ছোটরা এখন থেকেই যদি কিছু কিছু দায়িত্ব নিতে শিখি তবে নিশ্চয়ই আরও কিছুটা বড় হয়ে উৎসবের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা নিজেদের কাঁধে নিতে পারব।

সব শেষে বলি, আমার এই 'বাউল ফকির উৎসব' যেন আরও বড় হয়, এই উৎসবের নাম যেন আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে যায়, সহজ ধারা সঙ্গ করতে যেন আরও অনেক মানুষের আগমন ঘটে এই মিলন মেলায়। সকলের সারা বছর অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে, সকলের মাঝে মাটির গন্ধ ছড়িয়ে দিতে যেন বছর বছর ফিরে আসে এই বাউল ফকির উৎসব।

ছন্দকের কথা

অত বুঝাতাম না তখন। মনে আছে, শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে অদ্ভুত যন্ত্র হাতে একটা লোককে দেখেছিলুম। একমুখ দাড়ি। বিরাট জামাটার ক'জায়গায় রংচঙে তাম্রি। কৌকড়ানো আঙুলগুলো বাণ মাছের মতো ঝিলিক মারছে যন্ত্রের তারে-তারে। সেদিন সে কী গেয়েছিল মনে নেই। শেষে নুন-গোলমরিচ গৌফের ফাঁকে একমুঠো হলুদ দাঁত বের করে বলেছিল, “ভালো লেগেছে বাবাসোনা?”

বেশ ক'বছর পরের একটা দুপুরবেলা। স্কুল থেকে ফিরে সবে খেতে বসেছি। এমন সময়ে বাবার দু'বন্ধু হাজির হলো। উৎপল আর সাত্যকি কাকু। গুটি গুটি আলোচনায় কান পাতি। চাঁদা মেলা বাউল... ছেঁড়া ছেঁড়া শব্দ বুঝিয়ে দিচ্ছে যে বেশ বিশাল কিছু একটা হবে। কাকুদের বলতে শুনলুম, “তা অনেক টাকার ধাক্কা... এত চাঁদা উঠবে কিনা জানি না।” সাহসে ভর করে এগিয়ে যাই। আগের দিনের বাড়তি কাগজ-বেচা টাকাটা (আমার সর্বস্ব রোজগার) দিয়ে বলি, “রাখো।” ওরা হেসে ফেলে, “প্রথম চাঁদাটা তাহলে তুইই দিলি।”

ছোট্ট এই স্বীকৃতিটুকু ঘিরেই ‘সহজ ধারা’র সঙ্গে গড়ে উঠেছিল সম্পর্ক।

“বাউল দর্শন আয়ত্ত করা একজন্মে সম্ভব নয়”, বাবা হামেশাই বলে থাকেন। বারো-তের বছর বয়সী আমার পক্ষে দেহতত্ত্বের জটিলতা বোঝাটা কল্পনাভীত ব্যাপার। সুর শুনতে শুনতে হারিয়ে যেতুম। ছটফটে মনটাকে কেমন বেঁধে রাখত, শিকলি কাটার মন্ত্র।

গুরু গভীর তত্ত্বালোচনা যমের মতো ডরাই, আবার নীরস স্মৃতিচারণও খাতে সয় না আমার। মনে ভিড় করে আসা অসংখ্য ঘটনা একতারে বাঁধতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলতে বাধ্য।

তখন বয়স বছর তেরো। লালমোহন বাবুর মতো, একটা খাতা সবসময়ে পকেটে নিয়ে ঘুরতুম। মঞ্চ থেকে সটান পাকড়েছিলুম বাবু ফকিরকে। ‘স্কেচ করব’। হবু নন্দলালের বেয়াড়া আবদার রেখেছিলেন ফকির। হিজিবিজি আঁকা দেখে পিঠ চাপড়েছিলেন, “বেশ বাবা বেশ।” জানতুন না, ওঁদেরকে ফিরতে হবে সেই রাত্রে। অনেকে বাংলাদেশের সুদূর গ্রামাঞ্চলের বাসিন্দা। যাতায়াতের পথ অনেকটাই, তাছাড়া প্রথম কয়েক বছর বাসভাড়া বাবদ সামান্য টাকা বাদে আর কিছুই পেতেন না ওঁরা। এমন অবস্থায় সাধারণ কোনো অটোগ্রাফ-কুড়ানো শিল্পীর চটে থাকার কথা। কিন্তু ওঁরা তো শিল্পী নন, সাধক! এমন প্রচুর অযাচিত দাবি তাই হাসিমুখে সহ্য করে গেছেন।

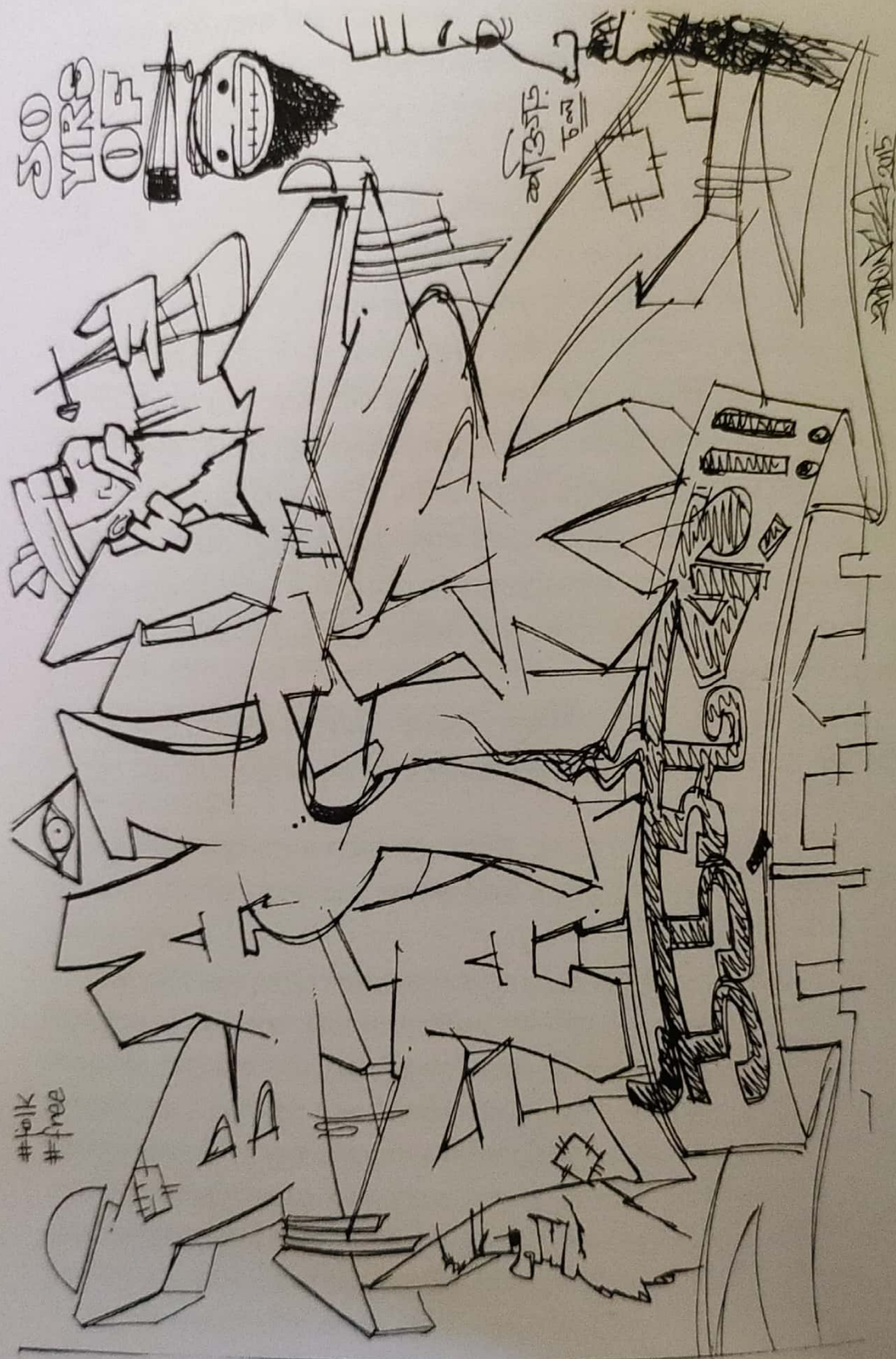
ধীরে ধীরে মানুষগুলির ঝাপসা চেহারা স্পষ্ট হয়ে এসেছে। প্রত্যেকবার নতুন চোখে দেখতে দেখতে অতীত-বর্তমান মাঝে মাঝেই এক হয়ে যায়। হঠাৎ মনে হয়, এই বুঝি বিশ্বনাথ বাউলের পাশে বসে মাথা নাড়ছেন সুবল গোসাঁই, যিনি ক'বছর

আগেই দেহের জীর্ণ বাস ত্যাগ করেছেন। গৌর খ্যাপা, দর্শককে ভাবসাগরে খেপিয়ে তোলার ক্ষমতা যাঁর ছিল, তিনিও আর নেই। বিশ্বনাথ বাউলের গলায় শিব-দুগ্গার পালা শুনতে শুনতে হাঁশ হারিয়ে ফেলি। অব্যক্ত একটা স্বরে চকিত ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি পাড়ার রিক্সাচালক ‘অমুক’ কাকা হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছেন। চোখ ছাপিয়ে নেমে আসছে জল।

গান ছাড়াও আরেকটা আকর্ষণ ছিল মেলায়। আসর ঘিরে নানা ধরনের উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য সাজিয়ে বসেন দোকানিরা। বাড়িতে বানানো কেক থেকে ভাজাভুজি। একেকটা দোকানে হানা দিয়ে খাবারের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেই ক্ষান্ত হতুম না আমরা, মা-বাবাকে রাজি করিয়ে কৌটো ভরে নিয়ে যেতুম। যখন গান শুনতে শুনতে ঝিঁঝিঁ ধরে যেত পায়ের, গরম ঘুগনি বা দুটো পেঁয়াজি আবার শরীর চাঙ্গা করে ফেলত।

দশ বছরে বাউল ফকির উৎসব বড় হয়েছে নানা ঝড়ঝাপটা সহিয়ে। এখন চারিপাশে বাউল সংগীতের ‘লেটেস্ট ট্রেন্ড’। কার্তিক দাসের মতো অনেকেই টেলিভিশনের নিয়মিত শিল্পী। কোথায় একটা ফাঁকা ঠেকে সবকিছু। মেলা হয়, কিন্তু সেই মানুষদের খুঁজে পাই না। পেশাদারিত্বের চাপ যেন ফকিরি সাধনাকে করে তুলেছে শহুরে বাবুর নিছক ‘আহা-উহু’র বিষয়। ব্র্যান্ড দোতারা হয়ে উঠেছে উঠতি আঁতলামোর ব্যানার।

মোবাইল, ল্যাপটপে হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে। নির্মল আনন্দে গান শোনার তাগিদ আর অনুভব করি না। প্রত্যেকবার আসতেই হয় তবু। খণ্ডিত অবচেতন ভেসে যায় ক্ষণিক ওড়ার আনন্দে।



ভূত। উদীয়মান গ্রাফিটি আর্টিস্ট অগ্নিমিত্র। বয়স ১৬।

মেলা আমাদেরও

Among the Men of Heart

Abeer Chakravarty

One good, merry evening I was matter of fact asked by Paban Das Baul whether I could fish. And when I told him, equally matter of fact, though slightly caught unawares, that I couldn't, he was aghast, and couldn't seem to accept how such a fundamental, basic skill of a human being as fishing could have not been a part of my upbringing and identity. It was the way he was so astonishingly amazed that couldn't make me ignore how much we have really detached ourselves from nature and her doings, and estranged ourselves from the elements. And how much we have moved away from the simplicity, generosity and rhythm of life. The Bauls and Fakirs never fail to link us instantly to our roots and prod us to connect to the 'tattwa' through their music, their beliefs and practices.

The heady Sixties and Seventies that erupted and spread with a cornucopia of music and songs embraced the Bauls. We found Purna Das Baul on the cover of Dylan's *John Wesley Harding*. We met hippies travelling to Bengal to be with the Bauls, taking some of them back. Heard Subol talk of his encounter with 'zaagersahib', unaffected by the honour and privilege. Globalization had an altogether different meaning those days!

When the Boral festival popped up, thanks to Paban and Mimlu, it became an annual pilgrimage and gave us a wonderful taste and experience of an 'akhara'. But it stopped all too soon creating a void till the veritable Woodstock of Bauls and Fakirs, the Baul Fakir Utsav, set up tent in 2006, at the end of a snaky Jadavpur lane, out on a field that was small but seemed to hold the world. It

grew with a belief and a passion that was determined and infectious. Even the neighbours around the field seem to welcome the festival each year, quite unfazed by the inconvenience it must be causing, only to do their bit to uphold a treasure and heritage that Bengal is blessed with. The makeshift auditorium and all the lanes and by lanes transform into an akhara, seamlessly blending in with surroundings. The spirit and vibes abound.

The Baul Fakir Utsav is not just about great songs and performance but a cosmic confluence that unfolds each year to help us commune with the very essence of life through their songs, and by their mystical presence. The Utsav stokes a dialogue within our self if we choose to go beyond just another cool, social happening. It's verily a 'satsang' unfolding in song after song the real meaning and purpose of life. In a world being seared by religious hatred and distorted notions of divinity, the Bauls and Fakirs make one more furtive, extraordinary attempt through the Utsav to get us to delve into some greater, singular meaning and purpose. In centering the focus on rekindling the search for the Man of the Heart, the Utsav brings together a pure plea for humanity.

It's a community that makes this Utsav happen and only a collaborative effort between the organisers, performers, and the audience can help this festival carry on, and thrive. And in doing so nurture the Baul Fakir community whose sustenance and well-being is crucial to our civilization and to our own well-being.

Abeer Chakravarty has just retired as Head of Bates, CHI, Kolkata. He has worked as a communications consultant for the past 35 years.

দশ বছর ধরে সহজে বাউল-ফকিরের সঙ্গ লাভ

শুভব্রত সেন

‘মন মজালে ওরে বাউলা গান’ গত তের বছর ধরে সত্যি এই বাউল ফকিরি গানে মজে আছি। জীবনের মোড়টাই আমার ঘুরে গেছে—কিন্তু এতটা হত না, যদি ২০০৬-এ আমারই বাড়ির সংলগ্ন শক্তিগড় মাঠে একটা ঘটনা না ঘটত। মনে রাখার মতো ঘটনা বটে। এক সময় প্রাচীন বাউল গানের সন্ধানে ও বাউল ফকিরের সঙ্গ লাভের আশায় আমি নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি—কত সাধুসেবা, মেলায় দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়েছি কিন্তু এই প্রথম বাউল ফকিরদের নিয়ে এই শহরে, বাড়ির পাশে একটা উৎসব হওয়াতে, আমি খুবই কাছ থেকে খুবই সহজে গত দশ বছর ধরে তাঁদের সঙ্গ লাভ করার সুযোগ পেয়ে আসছি।

পৃথিবীর সব নতুন সূচনারই সঙ্গে যেমন জড়িয়ে থাকে প্রশংসা ও সমালোচনা, আমাদের এই বাউল-ফকির উৎসবকে ঘিরে দেখা গেছে বেশ কিছু মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা, প্রশংসা এবং তার সঙ্গে কয়েকটি অভাব, অভিযোগ, সমালোচনা। এই উৎসবের যথার্থতাকে অনুভব না করে শুধুমাত্র তরল ও কঠিন নেশার ক্ষেত্র হিসাবে উৎসবের মাহাত্ম্যকে অনেকেই ক্ষুণ্ণ করে আসছেন। আমি বার বার বলে আসছি এবং ভবিষ্যতেও বলব, শুধু গান এবং গানটাই যেন আমাদের নেশা হয়ে ওঠে এই উৎসবকে কেন্দ্র করে। এই উৎসব বহু প্রাচীন, বাউল ফকিরদের উপস্থিত করে, যাঁদের শোনার সৌভাগ্য আমাদের খুবই কম ঘটে থাকে। সহজে নয় সুলভে আমরা এঁদের সঙ্গ পেয়ে থাকি, তাই হয়ত বাহ্যিক নেশার দৌরাঙ্গে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারি না। এত কিছুর পরেও এই উৎসব-আয়োজকদের সাধুবাদ জানাতেই হয়। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে গত দশ বছর ধরে এই উৎসব যে এক নাগাড়ে হয়ে আসছে সেটাই আমাদের সবার বড় প্রাপ্তি। কারণ বহু সং প্রচেষ্টাই মাঝ পথে থমকে যায়। তাই গুরু করা যতটা সহজ কিন্তু তাকে আবেগ দিয়ে লালন করে বহমান রাখা কঠিন।

একটি মঞ্চে এতজন বাউল ফকিরকে একসঙ্গে পাবার আনন্দই আলাদা। এই উৎসব থেকে আমার প্রাপ্তি বেশ কিছু অমূল্য গান ও কিছু বাউল ফকিরের নিবিড় সঙ্গলাভ—যাঁরা এখন আমার পরিবারের মতো হয়ে গেছেন। এই উৎসবের প্রথম কি দ্বিতীয় বছর একজন খুবই প্রবীণ বাউলকে দেখেছিলাম—নাম তাঁর ভক্তদাস। তাঁর একটি গানই আমার সংগ্রহে আছে—

কৃষ্ণের নাম কর্ণে কে আর শোনাবে...

আহা! খুব সুরেলা না হলেও, কী ভাব তাঁর গানে। আর এই ভাবই তো বাউল গানের একমাত্র মূলধন। সেই বজ্রযান তন্ত্রের গুরু সময় থেকে নিত্যানন্দ প্রভুর হাত ধরে

লালন ফকির, হাউড়ে গোঁসাই, যাদুবিন্দু, রশিদ সরকার, আবদুল করিমদের মতো মহাজনদের পদে সেই ভাবেরই ছোঁয়া আমরা আজ অবধি পেয়ে আসছি—যা কিনা তাঁদের সাধনলব্ধ উপলব্ধির ফলশ্রুতি। এই মহাজনদের পদ তাই এখনো আমাদের মনপ্রাণকে আন্দোলিত করে। কখনও বা আনন্দে বিহ্বল হয়ে নেচে উঠি, কখনও বা ভাবে নিমজ্জিত হয়ে চোখে জল চলে আসে।

এই বাউল ফকির উৎসব থেকে আমার প্রাপ্তি শুধুই গান। প্রত্যেক বছরই নতুন নতুন গানের সন্ধান পাই যা কিনা আমার সংগ্রহকে দিনে দিনে সমৃদ্ধ করে তুলছে। ২০১৩ সালের উৎসবের আনন্দ আমার কাছে তেমন ভাবে ধরা দেয়নি। কারণ আখড়ায় বাউল ফকিরদের পাশে বসে যে অপ্রচলিত গানের সন্ধান পাওয়া যায়, তা মঞ্চের বাঁধা-ধরা সময়ের অনুষ্ঠানে কখনই সম্ভব নয়। তাই আখড়ায় বাউল ফকিরদের সঙ্গে পাওয়াটা আমার মতো অনুরাগীদের কাছে পরম প্রাপ্তি। মহাজনের পদেই তো উল্লেখ আছে—

মনের ময়লা কয়লাগুঁড়ো দাও আগুন জ্বলে।

সাধুসঙ্গে সুবাতাসে তা উঠবেরে জ্বলে।।

এই ‘আনন্দ-বাজারে’ কোথায় যেন সেই আগের চেনা মুখগুলো নতুন অচেনা মুখের সঙ্গে ঘুরে ফিরে আসে। সুবল গোঁসাই, গৌর ক্ষ্যাপার মতো অনেক প্রবীণ বাউলরা আজ হয়ত আমাদের মধ্যে সশরীরে নেই কিন্তু তাদের উপস্থিতি এই উৎসবে সর্বত্রই অনুভব করি। আশার কথা এই যে এখনও বীরেন গোঁসাই, রঞ্জিত গোঁসাই, অনাথ বন্ধু ঘোষ, কানাই দাস বাউলদের গান এই উৎসবকে কানায় কানায় পূর্ণ করে চলেছে।

অনেকদিন ধরেই বাংলাদেশের বাউল ফকিরদের সঙ্গে লাভ করার ইচ্ছে মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই উৎসব আমাকে সে সুযোগও করে দিয়েছে। কয়েক বছর আগে টুনটুন ফকিরের সঙ্গে আখড়ায় কাটানো অন্তরঙ্গ কিছু সময়ের কথা আজও মনে পড়ে। খোদা বক্স, মৌলা বক্স ও আরও কিছু শিল্পীদের সিঁড়িতে শোনা লালন-গীতি পরিবেশনের পুরোনো ধারা টুনটুন ফকির, নজরুল ফকিরদের গলায় খুঁজে পেয়েছিলাম। লালন-গীতির এই ভাব এপার বাংলার কিছু প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যেও খুঁজে পাই, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিল্পীদের কণ্ঠে সুরের জাগলারি আর যন্ত্রের আধিক্য গানের মূল ভাব প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সিলেটের চন্দ্রাবতী রায়বর্মা, রণেশ ঠাকুরদের মতো শিল্পীদের কণ্ঠে রাধারমণ, দুর্বিণ শাহ, আব্দুল করিমের পদগুলো একমাত্র এই উৎসবেই শুনতে পেয়েছি। কলকাতার মানুষ এই প্রথম বাউল-ফকিরের হাত ধরে ‘পাল্লাগান’ ও প্রাচীন ধারার কীর্তনের স্বাদ পেল। এই উৎসব শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ।

আজ থেকে দশ বছর আগে কলকাতায় বাউল ফকিরদের একক উৎসব খুবই কম

আয়োজিত হত কিন্তু এই উৎসবের জনপ্রিয়তার হাত ধরে বিভিন্ন পূজো-পার্বণে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইদানিং বাউল ফকিরদের নিয়মিত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদিক থেকে আমার মনে হয় এই বাউল ফকির উৎসব এই শহরের 'ট্রেন্ড সেটার'। এটা লক্ষণীয় যে এই উৎসবের জনপ্রিয়তার সঙ্গে বাউল ফকিরদেরও জনপ্রিয়তা, প্রচার, প্রসার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই উৎসবের ব্যবসায়িক দিক নিয়ে অনেকেই সন্দেহান, কিন্তু অন্যান্য সংস্থার মতো বাউল ফকিরদের স্বল্প অর্থের বিনিময়ে বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ দিয়ে নিজেদের আখের গোছায় না এই উৎসব কর্তৃপক্ষ। যদিও ব্যবসায়িক দিক নিয়ে আমার কোনো আপত্তি নেই কারণ পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ না হলে এই উৎসবকে সুষ্ঠু ভাবে চালান কষ্টসাধ্য। তবে একটাই অনুরোধ, যে প্রবীণ বাউল-ফকিররা এই দুই দিন আমাদের আনন্দ দিতে এই উৎসবে উপস্থিত হন, কর্তৃপক্ষ যেন তাদের থাকবার ব্যবস্থার প্রতি আর একটু যত্নবান হয়। নতুন নতুন শিল্পীদের আরও বেশি করে দেখতে চাই এই উৎসবে। মুর্শিদাবাদে অনেক অনামী বাউল-ফকিররা আছেন যারা এই শহরে কখনও অনুষ্ঠান করেননি, তাদের যদি এই উৎসবে আহ্বান করা হয় তাহলে আরও খুশি হব।

এবারও মুখিয়ে থাকব ছোটো গোলামের কণ্ঠে নতুন কোনো মাইজ ভাঙারী বা রশিদ সরকারের কোনো পদ শোনার আশ্রয়ে। বাংলাদেশি শিল্পীদের কাছ থেকে দুদু, পাঞ্জু, লালন বা অন্য কোনো প্রাচীন পদকর্তাদের পদ শোনবার জন্য, নদীয়ার বাউল-ফকিরদের থেকে হালিম, মামুননদীয়া কুমুদ বা অন্য কোনো মহাজনের পদ শোনবার আশায়, বীরভূমের বাউলদের থেকে নীলকণ্ঠ বা ভবাপাগলার নতুন পদের অপেক্ষায়। আমার তালিকা বিশাল তাই আর তা দীর্ঘ না করে এইটুকুই বলব যে, এই রকম ভাবেই এই উৎসব তার সামগ্রিকতা দিয়ে আগামী দিনেও যেন আমাদের আরও সমৃদ্ধ করে তোলে।

জয় গুরু।

শুভ্রত সেন বাউল-ফকির সভা করা ছাড়া বন্ধুদের সঙ্গে অরগ্যানিক মধুর চাষ করেন।

Sketches of Baul Fakir Utsav

Diptanshu Roy

Who hasn't fallen in love with a baul song during one of those short winter trips to Santiniketan? That was my first interaction with the Bauls, as a kid. And the first time I heard this music in the city was at Jadavpur-Shaktigarh maath's annual winter utsav. It is perhaps the only annual baul utsav in the city.

The city gets to enjoy a few sporadic performances during Durga pujo and Kali pujo, but this utsav is pretty hardcore with 48 hours of non-stop music, jams, addas, drinking and socializing, no different from the folk festivals around the world. You have got to be really into this music to take it all in. If it is your first time it is a great way to get initiated into the world of the Bauls and Fakirs. You will find the best acts here not just from West Bengal but from Bangladesh as well.

The music starts in the morning of the very first day. It is fresh acoustic in the truest sense. You get to enjoy it like you did sitting at their akharas at some point in life. For me it has been the purest part of the festival. From anecdotes to songs, informal jokes, you also get to see the musicians interact like they would in their homes and akharas. These sessions have become more popular for the last couple of years with more people popping by to see the events. The crowd here, I would say, is pretty varied. You have people from the neighbourhood for sure, but I've also bumped into people from Japan, Denmark, France, America, and England! So it is pretty international as well! Which is actually not surprising, given the acts are good to conquer the world. Despite their humble looks, many of the artists here are no less than rockstars who have seen the world.

The afternoons post-lunch session, is at the akharas: sleeping areas where I have had some wonderful adda

sessions with music thrown in. I have some of the most beautiful memories with crazy Gour Khyapa, with him telling his stories accompanied by the ektara played like a khamak with Tinkori da backing him up on dubki. Those who have seen this are lucky. You can still experience some of these sessions on my channel on youtube/folkpick.

As the winter sun goes golden, the late afternoon music can be heard in the maath, with Amirul, Lalon Shah, Golam Fakir and Laal Chand getting into some high energy stuff. I recommend looking out for Hira Shah with his unique instrument, the sarinda. And if you ask him, he will show a few tricks with his instrument. . . bird calls and his conversation with the sarinda are highly recommended!

Finally, it is time for energy for the evening sessions with some snacks and tea. . . there are tons of delicious food to be eaten. . . from ghugni, phuchka, fish fry to gourmet stuff like 'mangsher pathisapta' . . . there is something new to try every year!

The evening gets a lot of people into the tent. But you have to be ready to sit on the floor, well padded with tirpol and straw. But I can bet you won't mind it as the show starts picking up. From here it goes on and on until a point when you think you just have got to hit the bed. Of course, you can be there till the end if you take the all-important tea and adda breaks from time to time.

Two days just go by very quickly is all I can say. I make sure to pick up some cds that are up for sale. . . and I would urge everyone to buy a couple instead of recklessly sharing it with friends. . . After all, you must gather enough fodder till the next year's utsav and I can bet you will not find such a striking line-up that easy unless you are willing to chase the bauls. . .

Diptangshu Roy is a very fine mandolin player, who performs at home and abroad. He works for Bates, CHI, Kolkata.



দীপ্তাংশুর ডিজাইন করা পোস্টার

Magic's Soul in Music's Dress

Rimi B. Chatterjee

What would the history of European magic have been like, had there been no Inquisition, no Reconquista, no cleansing of the Cathars and the Albigensians, no witch-hunts, no Troubadour twilight? What if the itineraries of the wandering alchemists, soothsayers, gypsies and philosophers of east and central Europe had not been disturbed by religious war, systematic repression, pogroms and organised terror? What if the greatest troubadours of the twelfth century had been left in peace to found schools and retreats, cloisters and universities, and their descendants were modern-day rockstars?

We are not quite in such a fortunate position here in Bengal, and we have had our share of war and repression, but to a remarkable extent, we have managed to come through the times of iron with an intact and still functioning magical society. By its nature, this intellectual tradition which is today most widely represented by the baul-fakirs, has been a secret one, surviving on person to person transmission, and at its core there will always be the intensely private relationship of the guru-shishya. This is not just a way of preserving the exclusivity of the tradition, it is above all inherent in the nature of magic: the spiritual science of will, emotion, gnosis and being is very hard to talk about. Perhaps that is why the rich metaphor of song has always been a popular vehicle, in every magical lineage, for the secret teachings. The baul-fakir tradition has one of the world's most complex, deeply lived and richly layered systems of magical signification in the world, and all of it is embodied in beautiful music. To listen to the songs of Lalou Shah,

Abdul Karim, Radha Raman or Bhaba Pagla is to be offered a course of instruction in the architecture of the human soul.

When things are bad and the mainstream of any culture frowns on the freedoms and oddities that come with spiritual scepticism, the secret tradition draws its horns in, and is transmitted only along the bloodlines of its custodians. Then to the casual observer, it will appear entirely absent from the world, and the rural landscape will be one of bland peasants and uninspiring popular cultures. However, when the electric energy of human will starts to throw off the heavy blanket of intellectual repression, then the whole culture starts to fizz. That is when large public movements of ecstasy and revelation become common. In the modern world where everything is ultimately a data-state, secrecy is no longer the weapon of choice to defend the tradition. Now the spiritually curious, the young at heart, are coming out on the streets with wide eyes, looking beyond the boundaries of their conventional lives and asking themselves questions about the big things of life. Many of them, lacking guidance, make mistakes, for in the process of denying received wisdom, one is often betrayed into foolishness. These young people need to know that others, wise ones, have gone before them, have burned in the same fires, and after the ashes cooled, they have raked them over and found the truth like a new-forged mirror beneath. Then they have sung, about tears, about the light, about desire and its traps, about the tigers and jackals within us, about the snake of lust and its poisoned breath. The path of the baul-fakir is the path of untrammelled will, the most free path out of all the ones we are offered at birth, and therefore it covers a lot of spiritual ground. Most of our journeys can be found mapped within it.

This Utsav is a unique marketplace of ideas. In the idiom of the tradition, it is a prem bazar, where hearts are bought with hearts on the shores of the great ocean where, once our business is concluded, we will all eventually set sail. Here you may buy whatever delights and wonders your heart desires, provided you have coin to pay for it, of which your personal god has provided you a store when you came to this earth. Lalon tells us not to squander the coin of the body, the time and thought of which we are capable, because if you do, then when you see your heart's desire pass by in the marketplace, you will have to go to her as a beggar. The truth is, while mainstream culture held undisputed sway in this land, love was only possible in the margins of society. In all other places, land and property nailed love and freedom to the wall, especially for women. But all was not lost: the wandering singers went everywhere, and in the shadows of evening the meek, the hopeless, the abused and rejected would creep out of the gloom of their kitchens and cowsheds and join them, choosing a scary freedom over the safeties of the cage.

But the freedom to love is ultimately the freedom to lose love, and the lessons of those losses are one of the types of rice you can buy in the prem bazar. There we are told the tear-soaked truth that in fact loss is the strongest arrow that points us towards heaven, because when we come to terms with all our losses we become light. Now we are all becoming baul-fakirs, because the young are the most free among us: free to do as they choose and therefore to fly or crash and burn. They desperately need the sanity of ages to see them through these interesting times. For city-dwellers, this festival is the perfect place to come and have your mind blown by the sorcerors and

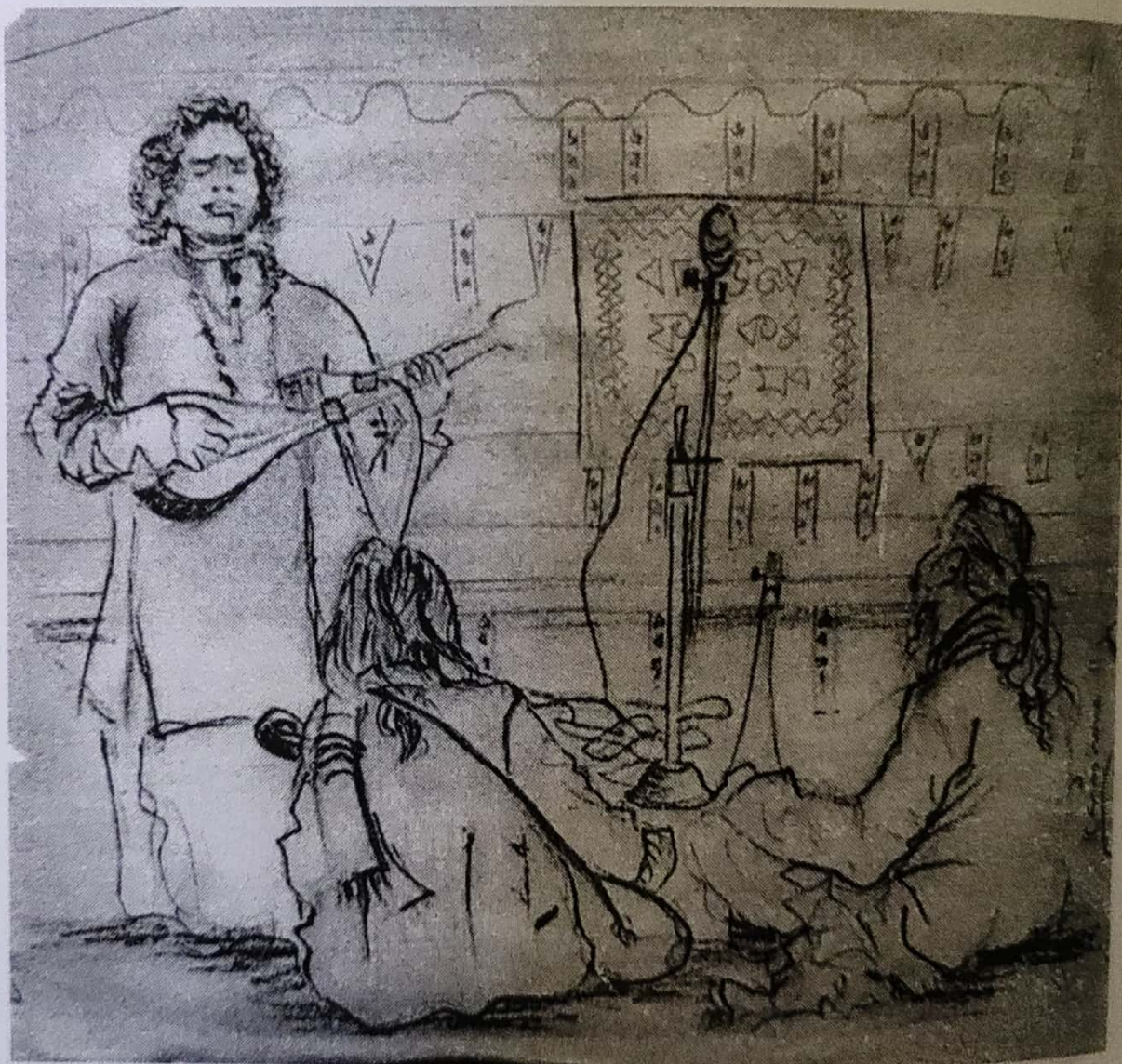
adepts of our time. Before the old ways pass into darkness entirely, the torch must be relit from young fires.

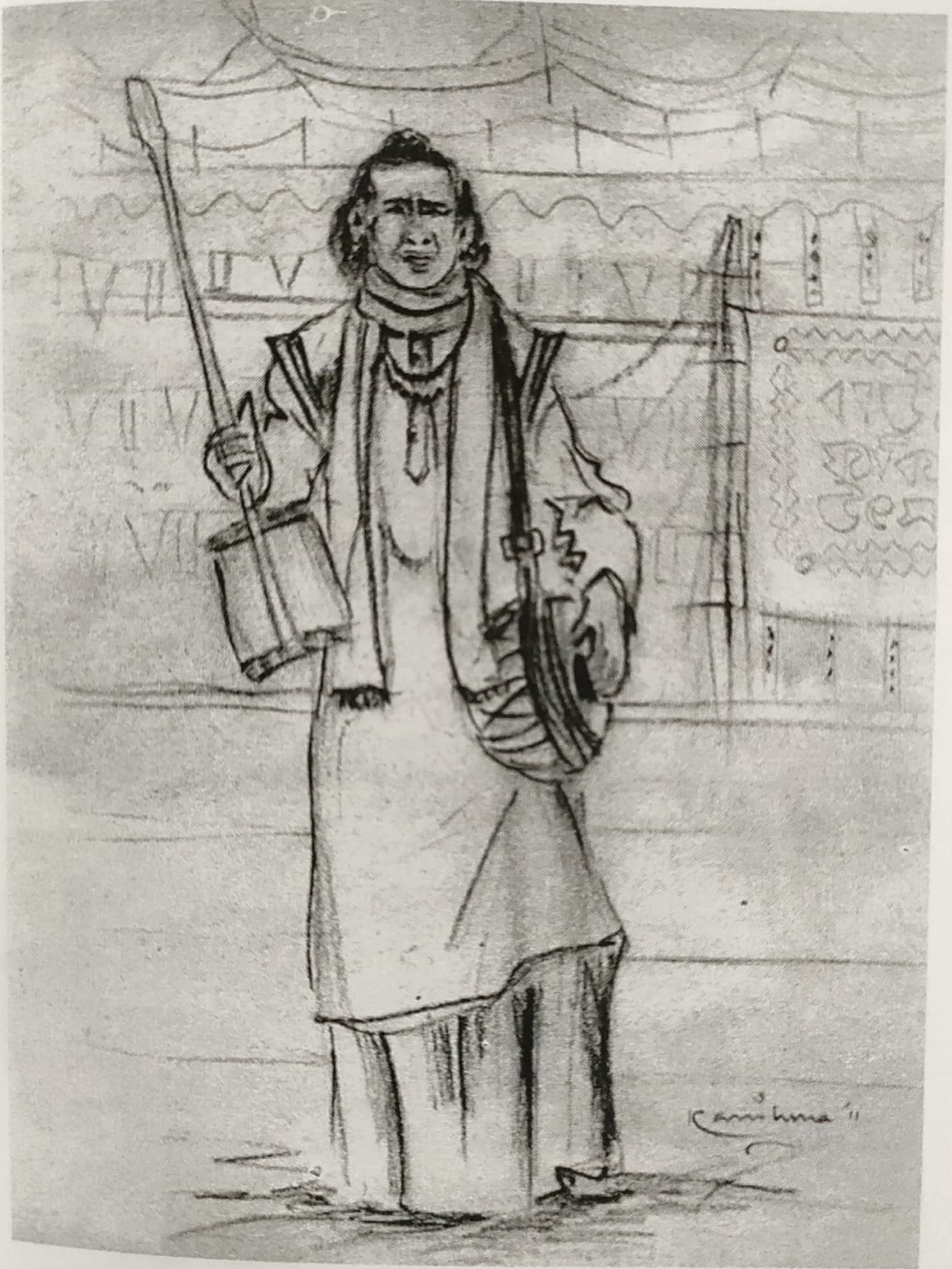
In this tenth year of its existence, this festival has shown itself a phoenix. Every time we fear that it will be the last, and yet every January people come together as before and trade their treasures in the marketplace. Every time our fears that the Utsav will not raise enough money, that the small and resolute band of organiser will be overwhelmed by the logistics, that it will all fall apart, are calmed and tamed by the music. It seems the illuminated souls of baul-fakirs in the hidden city are putting in a good word with fate for us. So long as this festival is true to the spirit in which it was begun, so long as it remains a true prem bazar, it will survive. As with all good things, it is always most in danger of damage from those that love it unwisely. Therefore we must all become wise, in so far as we can, and all will be well.

Rimi B. Chatterjee is a writer of fiction and teaches English at Jadavpur University.

স্কেচ

করিশমা সিদিকি





করিশমা পেশায় ফ্যাশন ডিজাইনার।

অন্য মেলা

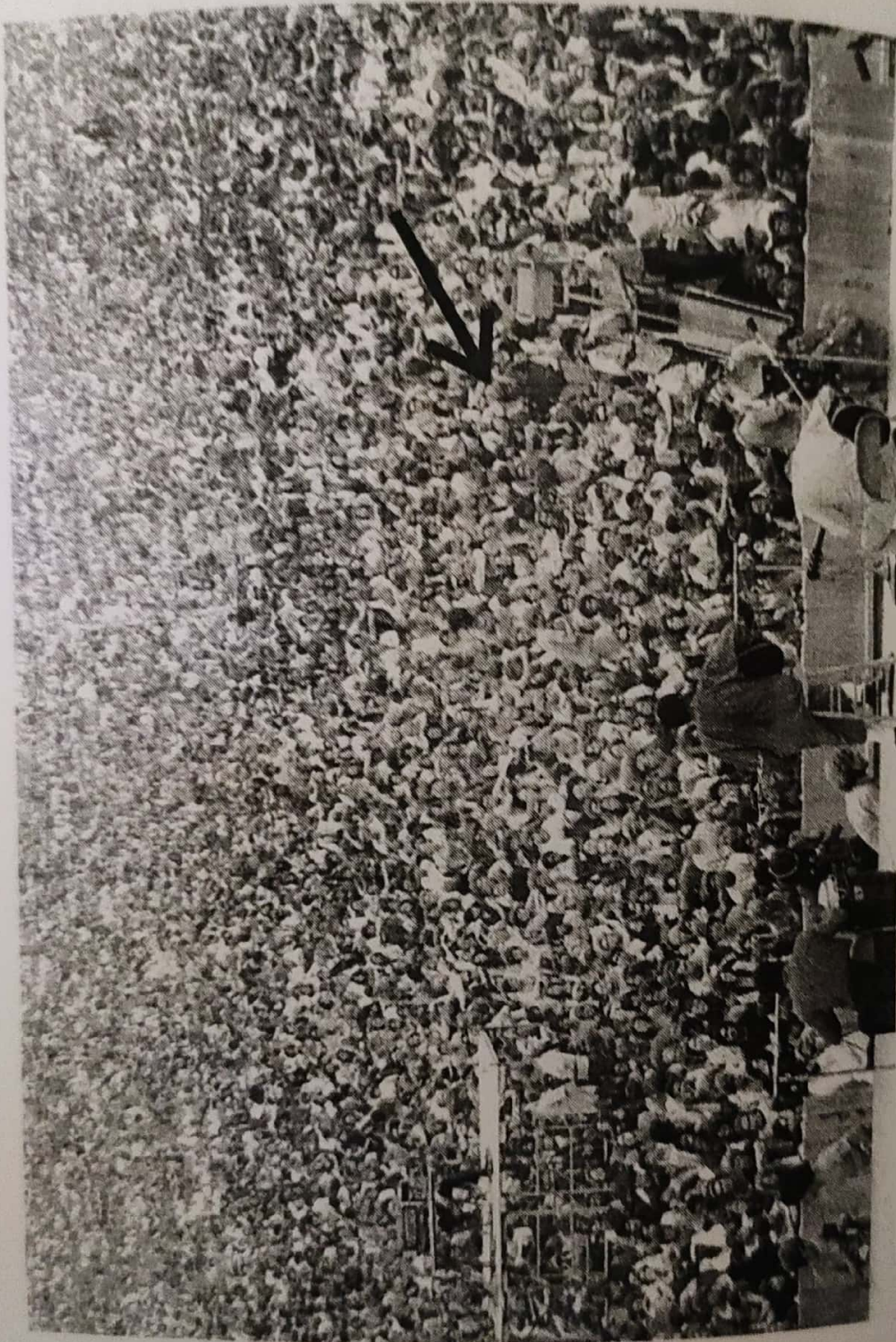
Memories of a Crowd.

'My girlfriends and I purchased our concert tickets in advance (I still have them). We took a bus up from NYC. The bus left us off miles from the site, after being stuck in traffic for hours. We walked and walked and walked. A river of people flowing in the same direction. One of my special memories of the event were the "locals"... people whose homes lines the main road on the way to the festival grounds. Families put out tables and were giving away sandwiches and drinks to whoever passed by. Children were running up to us insisting that we take something to eat and drink. Today I revel in the fact that there was no fear that drinks were laced, or tainted sandwiches were handed out. Finally reaching the concert site was a mixed emotion. It was AWESOME to see so many kids like us, but by the time we got there... we were so far from the stage it looked like a pinpoint in the distance. I have speakers in my home today that I could swear are more powerful than the ones they had on stage. Could barely distinguish who was singing. . . but it didn't matter. The atmosphere, the excitement and the experience were worth it all.'

--Eileen Mamanov.

'My friend Bob and I drove through mobs of traffic on Friday to park within a few miles of the festival grounds. We trekked in by foot. By the time we made it, the fences were down, our tickets were unnecessary, and the music was on. But what stopped us in our tracks was the massive size of the crowd, with all its energy and makeshift madness. Through thirst, hunger, rain and song, we bonded as one huge organism. Three days later, after Jimi brought those of us who stayed to a rousing finale, we drove home to lives that would never be the same again.'

--John Bowman.



'... this pic... shows me so prominently! For once I don't havta go crazy looking for myself' --
Chayala Davis, Woodstock, 1969.

An Annual Pilgrimage of Another Kind

Gurpal Singh

Attending the Baul Fakir Utsav, a couple of years ago was a wonderful experience for me. While the music is always magical, what made it more special was the fantastic atmosphere. The tent, the straw on the ground, the stalls selling home-made food and wonderful handicrafts; and the excitement in the air. The joy and the camaraderie was totally infectious. What I saw and experienced apart from the music was a wonderful community of people who loved this music and were going great lengths to keep it going, and doing this happily, with their hearts in it. I could not help but be reminded of the festival of films that we do in Puri each year. For some, this has become an annual pilgrimage of another kind.

Much like the Baul Fakir Utsav, BYOFF (Bring Your Own Film Festival) was born from a dream of some 'independent minded' people. Some filmmakers got together and wanted to create a small informal festival where we could all be ourselves, without anyone being judgemental, where we could meet and share our films and ideas and experiences and thoughts and stories with each other, in a free and open space. As far away as possible from red carpets, formal functions, award ceremonies, and the accompanying tamasha. Truly, a 'filmmakers' film festival'.

We zeroed in on Puri, on the east coast. The year was 2004. Hotel Pink House, a small and somewhat secluded little place with a character of its own became our venue, right on the seashore. People who liked the idea, joined forces - a beautiful collective energy emerged and before

long we had sent out an email to friends and groups in various cities. The idea was, if you have made a film that you want to share with other filmmakers and artists, just land up, choose your own time slot and screen the film.

While we were busy with preparations, expecting about thirty or forty filmmakers, the mail we had sent out was shared with quite a large number of people and the responses started pouring in. The idea had spread and was received very well, way beyond our expectations. Instead of one tent and screen, we had to put up two. And later we decided to start the screenings earlier than planned. Not wanting to say no to anyone, we kept trying to increase our capacity, not knowing where the funds will come from. We even had a 35 mm and a 16 mm projector for outdoor screenings. Like nervous relatives before a wedding function, we waited with bated breath.

And then they started trooping in. Over 300 people landed up with their films, in addition to the ones who came to watch. We extended the festival from the initial three days to five days. Many people changed their travel plans and stayed on. It was an incredible energy that flowed. A wonderful little community was born.

Independent cinema asserted itself. Everyone celebrated.

Filmmakers had come from all over the country and some even from abroad. To begin with we were at a loss, not having anticipated such participation. But that soon became the strength, as the participants took on various tasks and became volunteers. In the same collective spirit, the venue was decorated, handmade delegate cards were made, the schedule was put up and the festival began. We did not bother, for the moment, about money; we were all on a high, the high of finding a space to let our hair down, to be free and to share what we always wanted to share

with each other. Complete strangers became the greatest of friends. Music started flowing after the night screenings. Impromptu jams happened. Soulful Oriya and Bangla songs mixed with the sound of a didgeridoo were heard until the sun came out. There was poetry, dance and of course films, films and more films . . .

The most heartening part was that this festival egged on some people to become filmmakers. Having nurtured dreams so far, they had now made and brought short films 'because such a festival existed'. Partly by default, many of the participants were first-time filmmakers, and their young energy and enthusiasm took this gathering to another level.

Somehow, some funds were raised after the festival was over and we were able to pay back some of the loans and outstanding amounts. Against all odds, the festival had happened. In subsequent editions, we had to make sure the scale was smaller and more manageable. Growing too big would be a compromise with the spirit of the festival, we thought.

Since there was a lot of good press, (without our having worked actively towards it) everyone felt that the next year would be a cakewalk and sponsorships would come pouring in. But that is precisely the danger to be wary of. Money from the government and corporations never comes without riders. And here we were, trying to create a space where expression would be free and open. We decided that most of our funding would come from people – friends and well-wishers of Byoff. And the tribe of such people kept growing. There have been people who have never been able to attend even one Byoff, but they support us. Thanks to all these good souls we have managed somehow to keep going all these years and have

been able to freely screen films that would not be easy to show in many places. Films that take on the establishment, films that break new ground and films that push boundaries. And equally importantly, we have managed to create a meeting ground for minds.

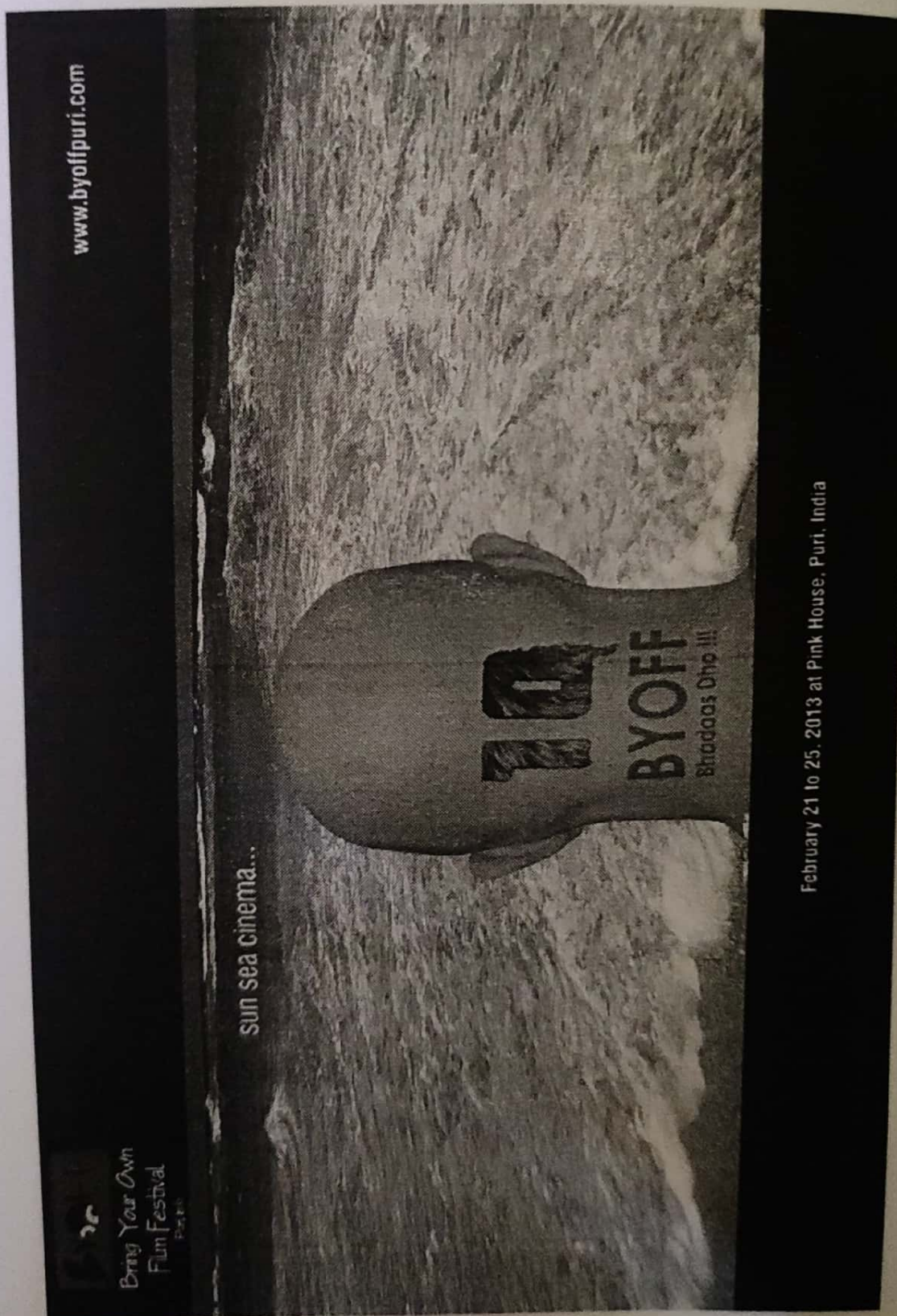
Its been a long eventful journey and like all such events, Byoff has had its share of ups and downs. The biggest issue that plagues us all is the question of funding. More than once, we have wondered whether we would be able to continue. The irony is that if you grow bigger, it is somewhat easier to raise funds, but then you also have to 'go along' and do the bidding of others. You have to become formal, institutionalize . . . and that has its own set of dynamics.

Another factor also needs to be looked at, with respect to a film festival. Technology changes fast. Indeed it's because the technology to make films became more easily available that a new breed of films and filmmakers came up, and Byoff filled a huge gap. But we also need to realize that Byoff started at a time when there were not many avenues for independent films, specially short films. The internet has now come into that space in a big way. A filmmaker needs to just upload his film and in a matter of days, hundreds or thousands may watch it. And recently, many small film festivals in far-flung towns have come up. A filmmaker from Panchkula in Haryana needs to travel to nearby Chandigarh and participate in a festival there. One from Nokha in Rajasthan would need only go to Bikaner, a few kilometers away. There are film festivals in places as diverse as Guwahati, Ballia and Madurai. All these have happily ensured that those who could not find expression earlier, now have more options.

In this context, its time for Byoff to re-invent itself. For all such initiatives, new people must join, new ideas must emerge; and for it to sustain, young blood must enter the stream. Now that short, independent films have started finding other avenues, I feel its time for Byoff to shed off its old skin as just a film festival and enter a new avatar as a multi-arts festival for all the independents, encompassing music, sculpture, painting, photography, poetry, installations, performances. All the arts and all artists would benefit greatly by being together in such a adda space, interacting with and reacting to each other's works. Right there, in the sand, with the sun and the moon, and the sounds of sea upon them.

As I look forward to another wonderful edition of the Bawl Fakir Utsav, I wish for its long life. I wish it grows from strength to strength. May it inspire more such festivals. May the independent spirit always be alive and throbbing. May the wonderful music always play on.

Gurpal Singh graduated from the Film and Television Institute of India, Pune. He has worked in television as a director and actor and has made a few documentaries. Gurpal enjoys and organizes gatherings and community building.



BYOFF 10

আরও একটা উৎসবের কথা পারফর্মাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট (PI)



আমরা কোনো পণ্য তৈরি করতে বা পরিষেবা দিতে চাইছি না। সংযোগ আর সম্পর্কের মাহওল তৈরির চেষ্টা করছি শুধু—*atmosphere of communication*—শিল্পীর সঙ্গে শিল্পীর, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর, মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে স্থানের, স্থানের সঙ্গে মানুষের ... আমরা ধরে নিই, সেই মাহওলের ভিতরেই আর্ট জেগে ওঠে, আবার তার মধ্যেই মিলিয়ে যায়। পারফর্মাস আর্ট এমন একটি শিল্প মাধ্যম, যেখানে নানান শিল্প আর চিন্তা এসে মিশতে পারে।

পারফর্মাস ইন্ডিপেন্ডেন্ট-এ আমরা তেমনি আমাদের ব্যক্তিগত নানান আর্ট-প্র্যাক্টিস আর শিল্প-ভাবনা নিয়ে জড়ো হয়েছি। টাকাপয়সা আমাদের বিশেষ নেই, বন্ধুদের কাছ থেকে আর সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা তুলেই কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল পারফর্মাস আর্ট ফেস্টিভাল (কিপ্যাফ)-এর আয়োজন করছি গত তিন বছর ধরে। এই সময়ে দাঁড়িয়ে, এই রকম একটা ফেস্টিভাল-এর একান্ত প্রয়োজন আমরা অনুভব করছিলাম। সংযোগ আর সম্পর্ক গড়ার এই উৎসব করতে আমাদের অনেক অনেক সরকারি টাকা, কর্পোরেটদের টাকা—এত কিছু ও হচ্ছে না।

প্রাচীন সাধুসঙ্গ আর মেলা-মোছবের রীতিনীতিকে এই আর্বান-আর্টের আদর্শ করে আমরা আমাদের উৎসবে অতিথিদের সেবা দেবার চেষ্টা করি। বাইরে থেকে কিপ্যাফে যোগ দিতে আসা শিল্পীদের যাতায়াতের খরচ বা সাম্মানিক দিতে পারি না, কিন্তু আমাদের কাছে এলে আমরা তাদের যত্ন নিই, খাইয়ে দাইয়ে রাখি, যেখানে যাবার সঙ্গে করে নিয়ে যাই বা যাবার ব্যবস্থা করে দিই। ঘরের শিল্পীদের জন্যেও একই রকম ব্যবস্থা, যতটুকু পারি।



Performers Independent at work on the streets of Kolkata

*'if Jodi is hoi,
Yet tobu,
But kintu,
What mane ki?'*

We are a group of independent performance artists, engaged for the last three years in organizing a festival of performance art in Kolkata, the Kolkata International Performance Art Festival (KIPAF). Performance art has the potential to convert a space with hidden tensions into a contested space by introducing and interrogating these tensions. Kolkata is one such space, and at KIPAF we aim to explore the concept and materiality of space in its multiplicity and complexity of potential and meaning and reveal the possible contestations, both visible and invisible, that this city space can hold.

Not just the sites of the festival, but the festival KIPAF itself is emerging as a site of contestations, challenging the notions of organization and curation. What indeed is organization? What is curation? And what are the broader implications of the ways in which the curatorial space is produced and circulated? Where do we stand in relation to these modes of production and distribution? We look for answers to such questions through our arts practice.

We don't aim to create any commodity or service.

We try to create an atmosphere for communication among artists and friends and also with the place and its people. We presume that art rises or falls out of atmospheres.

Performance art offers us a medium where diverse disciplines can meet. We try to work with the bare minimum as far as money is concerned. We organize KIPAF with small contributions and donations from friends and public bodies. We think it necessary to keep this festival as a place to practice art and interaction

outside the patronage of big capital. Unable to offer the artists any remuneration or travel expenses to and from Kolkata, all we can do is to take care of the curated artists' hospitality and local travel within the city. We try to share the same with all our participants, as much as our limited resources allow.

Performers Independent's basic concern is to bring the science and art of traditional hospitality from our traditional spaces and local fairs (shadhushanga) into our present urbanart contexts.

Performers Independent is an open collective. We don't have closed group meetings and gang up according to work and leisure. Most of our meetings take place in the streets of Kolkata. Some of our old and new sinners are uma, rituparna, aopala, sumantra, troyojit, ankur, tapati, chirantan, taufik, anirban, sukanta, moushumi, sanchayan, bukan, sambaran, rupan, rahul, amitava, partho, sreemoy, santosh, prasant, pobitro, arghyadip and the 3 sumans. There is more. . .

From Thailand to Bengal and Back

Robert Millis

In October 2012, I was at a conference of archivists and music collectors in Delhi, getting bored with all the discussion about temperature control inside the vaults of archives and copyright worries of collectors and artists, when I bumped into another bored participant and we got talking. Her name was Moushumi; she said we had not met before, but I thought that we had. The familiarity was natural as we seemed to have a lot in common — especially in our attitudes to practicing and sharing music. I had only just arrived in Delhi from Seattle, on a Fulbright scholarship, and my plan was to study India's early 78rpm gramophone recording industry and work with Indian record collectors, musicians and sound artists over the next ten months, traveling to various places around the country, including, of course, Kolkata. Moushumi and I exchanged emails and within a few weeks I was in Kolkata, staying at the Broadway Hotel in Chandni Chowk, and working my way to different parts of the city to meet record collectors and musicians. I was also spending time in Jadavpur, getting to know the work and world of Moushumi and Sukanta and meeting their friends. This seemed like a very busy time for all of them as they were preparing for their upcoming music festival in early January. It was the beginning of December and I would have to go back to Delhi for work fairly soon. Moushumi and Sukanta asked me to come back for their festival and I do not at all regret that I did.

I am a musician, producer and sound artist and all my life I have done my best to travel as much as I can, usually on a shoe-string budget, and wherever I have been, I have

sought out music and sound. I am lucky enough to work with a few small record labels in the USA to document some of this music and so find myself quite often at musical events and festivals that I don't always understand logically, but find a connection with emotionally. Kolkata's Baul Fakir Ustav in 2013 was one such event. I arrived a day or two before the festival began, accompanied my new friends in Jadavpur to one of their last-minute meetings, did not understand a word of what was being discussed in Bangla, but it felt generally very good to be there. To wrap up the meeting that night, everyone asked Nazrul Fakir of Bangladesh to sing and he sang to the drone of his ektara, which was lovely. The next day I came in early and helped to put some red and green and yellow stickers on CDs which would sell at the festival. I am not particularly knowledgeable about the music of the Bauls and before 2013, I knew even less. But I had a quietly transcendent time that weekend, especially during the smaller gatherings of musicians, the jam sessions, and solo performances (also eating biryani and various snacks at some of the food stalls while people-watching, but that's a different story. . .)

If you are reading this you are most likely attending the Baul Fakir Ustav and are well aware of the music of the Bauls. Aware of the stories in their music. Aware of their spiritual seeking, aware of their syncretic Hindu-Islamic views. Or perhaps you are here to get high behind the performance tent, to get drunk while music plays, to get out of the house, forget about school or work, see friends and you don't really care what underlies this music, this gathering. Perhaps you'd rather techno was playing. . . and that's fine too (well not really, at least for

me; techno is pretty dull and empty compared to the music of the Bauls). Gatherings such as this are as much about community as anything else. As I was saying before, I am not terribly knowledgeable about the music and spiritual traditions in Bengal but during the 2013 Ustav I began to sense a connection to other 'spirit festivals' I have witnessed, despite the outward appearance of extreme differences. Perhaps this is the way of such things.

One such festival was Thailand's *Phi Ta Khon*. Again, before I went to it, I knew little beyond a few pictures of beautiful masks seen online. Yet in June 2004, I found myself in the town of Dan Sai in the Isan region of Northern Thailand where this festival was taking place and it turned out to be a fantastic few days in the midst of a very welcoming and sublime small-town bacchanal. I was able to turn my experience at this festival into a lofi documentary film, eventually released on DVD by a small record label called Sublime Frequencies. 'Phi Ta Khon' means, roughly, 'spirit into human' though sometimes it can mean 'ghosts with human eyes'. The language, music, food and customs of Isan have more in common with Laos, which lies across the Mekong to the North, than with Thailand proper. Apparently, there used to be festivals like Phi Ta Khon all over this region, but as with all things, they are vanishing. Outwardly, Phi Ta Khon is about ensuring a good harvest and celebrating the arrival of the monsoon season (in many parts of Thailand this involves firing rockets into the clouds to produce rain). The Phi Ta Khon and similar festivals begin with making things right with the village, with the ancestors and spirits and from there the teachings work their way backward to the individual. It seems to me that the

reverse is true with the Bauls: they carry their inner knowledge to the outside world. However, at their core, both events celebrate community music making, coming together, using trance and ceremony and song to create some personal experience with a principle beyond the mundane.

Phi Ta Khon draws inspiration from the *Jataka*, or tales of the Buddha's previous lives (often the subject of the fantastic paintings that adorn Thai and Lao Buddhist temples). Other legends speak of a Romeo and Juliet tale of forbidden love: a couple, forced apart by their families, elopes and hides in a temple. They hide in a tunnel where donations and offerings are stored. Mysteriously, of course, the tunnel is sealed; the couple is trapped and dies inside. United in love and in death, they become guardian spirits of the community and represent the possibility of an eternal, celestial love.

As at the Baul Utsav, music is everywhere during Phi Ta Khon. In fact perhaps more so, as Phi Ta Khon is spread across the entire town (which is probably the way things are with traditional, rural Baul festivals). There are live bands, loudspeakers and boom boxes seemingly everywhere, all designed to lull the participants (and the gods) into a trance-like state. The principal instruments used are the *khaen* and the *pin*. The *khaen* is a mouth organ (with a sound not unlike a harmonium) from the mountains of Laos and the *pin* is a small three stringed Thai guitar, often with two necks for two different musical scales. The primary musical forms in Isan, as in much of Thailand, are *mo lam* and *luk thung*. Both are generally songs about love, but *mo lam* also incorporates themes of fate and karma. Spread over several days, the music is generally acoustic at first and as the festival

progresses it gradually becomes electrified, eventually returning to quieter acoustic instruments at the end. On the surface, there is very little commonality between Baul and Thai music. They each use different scales, instruments, melodies, phrasing, structure . . . but there is a simplicity at the heart of each and a desire to bring the audience into the music and its stories.

Masks and outfits made of coconut husks, bamboo rice steamers and shredded rags with bells transform Phi Ta Khon participants into characters from stories and myths: ghosts, devils, demons, and spirits unleashed for a bacchanal. Wooden phalluses, always a popular protective amulet in Thailand with origins in fertility rites and Hindu Shiva worship, provide comic relief and heighten licentious behavior. They are jabbed into the sky (and at each other) in the hope of producing rain. That the masks are made of rice steamers and coconut husks reinforced the 'good harvest' focus of Phi Ta Khon.

The Bauls too sing stories from legends and mythologies. I have a 78rpm record of a "Baul" sung by one M. N. Ghosh, alias Mantu or Monta Babu, recorded in 1919. It is a point where folk music and recording meet at least in some form, also a point where classical and folk music meet (because M. N. Ghosh also recorded classical and semi-classical songs). This 'Baul' then was probably recorded specifically for commercial release. I wonder why or to whom they were trying to appeal? Was there an emerging class (as there would be in the USA) of people thinking folk music was somehow an authentic expression of the "common" people, from which deep but simple lessons could be learned? Was it a yearning for simpler times? Or was it a genuine appreciation of folk forms and melodies? An attempt to source new melodies

for classical-based music? An attempt to appeal to a different (non-elite) audience?

The question of what constitutes folk or traditional music — what is 'authentic' — is an interesting and complex one. For me, an urban American musician, I know that in some ways the term 'folk music' is just an easy way to identify a sound or style. Does the same principle apply to Baul music? Those Bauls who have become famous and traveled the world and whose sound and style bear marks of these travels do they still remain 'authentic' Bauls? As more urban dwellers and foreigners discover rural Thai festivals and music, as television and the internet bring the world "together" what happens to these musical forms that once grew in isolation? Is change necessary and good. . . or does such music, itself the product of generations of influence, for some reason now need to be preserved as a bug in amber?

The first commercial recordings in India were made in 1902 — not many recordings came before that. It is very interesting to me that so little folk music was recorded commercially in India (much more was recorded in the rest of the world, though perhaps not until the 1920s and 30s, when it was discovered that 'poor common folk' would buy such things). Yet here is someone recording something at least from that repertoire. Most recorded music at this time in India was classical or light classical based, with plenty of theatre music thrown in for good measure. Perhaps there just was no market for such things and their sense of 'authenticity' was different than how we think about it today. The M.N. Ghosh recording in question was made by George Dillnutt in Calcutta. These European recording engineers would probably not have cared at all if someone had brought a 'real' Baul to

them to record, as long as they were assured of an audience for such things. I wonder if there were respectability issues at play in whom was being recorded? There must have been. Perhaps on the Indian side such social issues were important--whom they presented to the Europeans for recording--and to the European engineers it was purely economics.

Almost a hundred years after that recording was made, some of these questions still seem relevant when I think of the Baul Fakir Utsav. The festival is an urban creation, it is new and unlike the Phi Ta Khon, it does not have its given set of rituals to follow, but seems to be inventing rules and rituals of its own along the way. But it clearly satisfies the needs of a very large number of people. Why? What do people find in this music? How do they connect with it?

The Phi Ta Khon festival unfolds over three days along these lines:

It begins at 3:00am. Opening prayers are intoned, a first round of drinks is passed from musician to musician and the presence of a transcendent monk who attained supernatural powers is invoked. A procession, lead by the musicians, moves from the local river to the Buddhist temple where more rituals are performed, an old rusty shotgun is fired a few times and everyone has a few more rounds of rice whiskey. Breakfast is served to all and the *Bai sri sukwan* ceremony begins. This involves the creation of a *Bai sri*, an enormous multi-level offering made of rice, banana leaves, coconut, and candles and the tying of white string onto everyone's wrists. The strings impart blessings, protection and strengthen the soul or *kwan* of the participants. In my mind, the faithful are literally and physically connecting themselves to each other and to the

sublime with these strings. From here, the afternoon and evening becomes one long party with dancing, jamming, singing, drinking and eating.

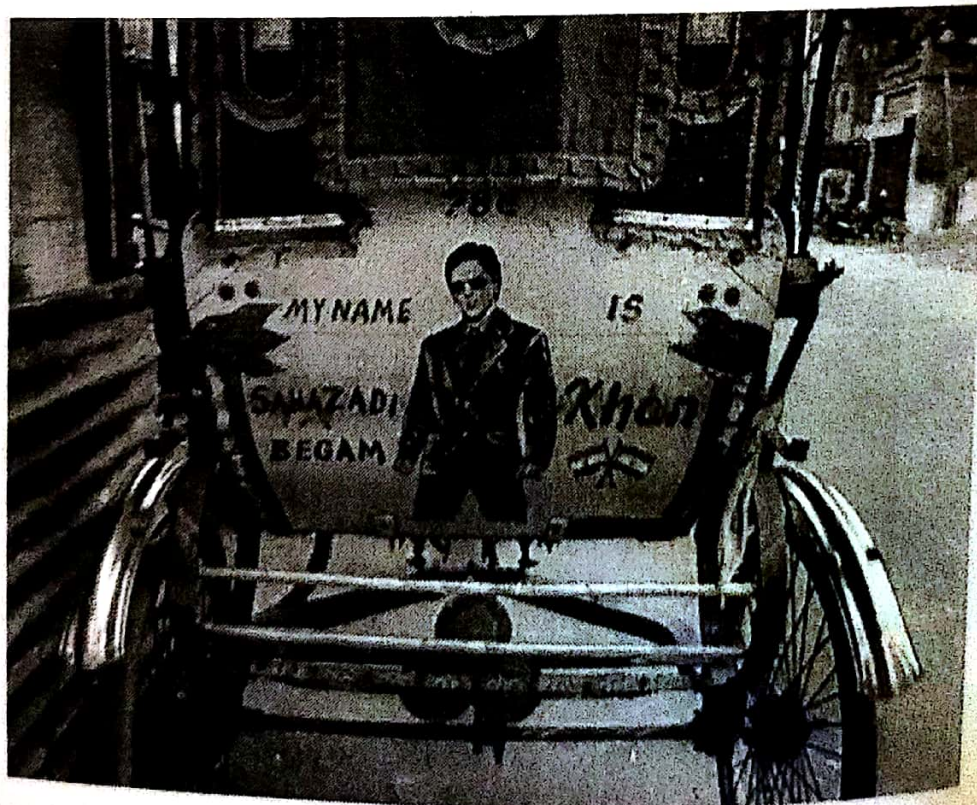
The next day begins with a huge procession through town around 9 in the morning, with everyone in costume and drinking rice whiskey. Pick-up trucks filled with musicians and powered by generators vie for volume supremacy with blown out speakers, loud hailer, and whatever instruments can fit on board. The music continues all night. On the third day things become a little more introspective and sedate (or hungover). There are Buddhist sermons, private ceremonies and offerings to the life-giving river.

Interestingly, the festival originally climaxed with participants offering their masks (essentially representations of the spirit world) to the river. Apparently folk art collectors and shop owners used to fish the masks out of the river downstream from Dan Sai and sell them at markets in Bangkok. This put an end to that tradition and now the masks are kept for future Phi Ta Khon festivals or sold by their actual creators.

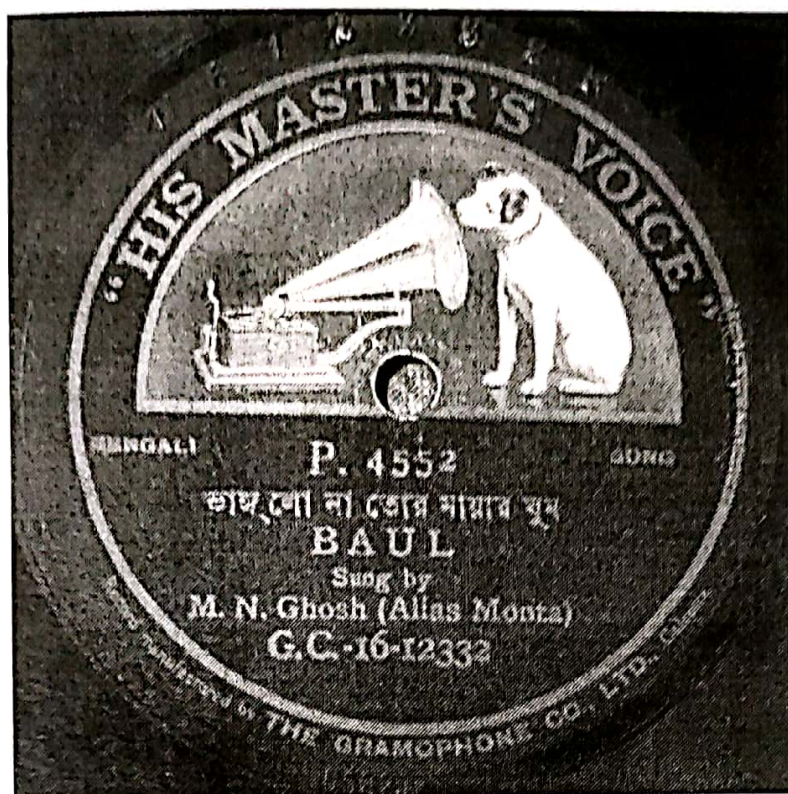
Though Phi Ta Khon may appear at once pagan and holy, animist and Buddhist, Thai and Lao, and full of incongruent characters and situations, it is important to remember that the Thai are master assimilators: everything falls into place and works together for the participants, coming back to merit-making for the future while living in the present. It was this syncretic aspect that struck me as having similarities to the work of the Bauls: how they combine different teachings, musical influences, and stories. Not to mention the ragged costumes and the trance like atmosphere created through endless music. And then of course, there is the

community aspect of these events. For many of the attendees this is simply a party, for others it is a serious and important event. But the two are not mutually exclusive.

What fascinates me – a Western atheist – about 'spirit' festivals from other parts of the world (ie, not the USA)? Is it some unresolved or unrealized spiritual yearnings or a voyeuristic fascination with an 'other'? An enjoyment of the power that swirls around such events? Perhaps my ear looks for non-Western melody, and seeks something beyond language, because I cannot speak the language anyway and this makes it easier to hear and to imagine into what I am hearing. (This is only partly true in actuality: there is simply not enough time to learn all the languages I would like to learn, not enough time to understand all the music I have encountered. But I try, mostly failing.) The Stanislaw Lem novel *His Master's Voice* is about an extra-terrestrial message that arrives on Earth. The problem is, the human race can't understand it, despite endless effort. What is it trying to say to us, about us? There is a sense that it somehow holds a key. But perhaps the key is already there within us, perhaps the message is merely a mirror. This is the effect such festivals and gatherings and music have on me.



From the streets of Jadavpur, as seen by Robert.



From Robert's record collection.



Phi Ta Khon

কান তৈরী করুন ভাই

সৌম্য চক্রবর্তী

আমার যখন ক্লাস নাইন তখন খালেদ চৌধুরী একদিন বাড়িতে একটা বিশাল বড় আর ভারী চৌকো বাক্স নিয়ে এলেন। ছাই রঙের ওপরের ডালাটা খুলে দেখালেন—একটি Ferrograph স্পুল টেপ রেকর্ডার। কী অদ্ভুত সব যন্ত্রাংশ। কোনটায় কি হয় বুঝতে সময় লাগে। আর কী সুন্দর ফিনিশ! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম।

কোনো বোতাম নেই, সব ছোট ছোট লেভার আর খটখট সুইচ অথবা মসৃণ নব। আর প্লাস্টিক বা মেটাল স্পুল স্পিন্ডেল পরিয়ে টেপের লেজটা হেড-এর সামনে দিয়ে নিয়ে গিয়ে খালি স্পুলে জড়িয়ে টেপটা বাজনযোগ্য করা তো সেলাই মেশিনে সুতো পরানোর মতই রহস্যময় এক প্রক্রিয়া।

সেই আমার টেপ রেকর্ডারের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

ওই যন্ত্রটির সঙ্গে পরবর্তী ৬-৭ বছর অসংখ্য ঘণ্টা কটিয়েছিলাম। খালেদ চৌধুরী বড় বড় স্পুলে অজস্র ক্লাসিকাল পাশ্চাত্য বাজনা, ক্লাসিকাল ভারতীয় বাজনা এবং সর্বোপরি বাংলার বিভিন্ন অংশের লোকসংগীত বাজাতে শুরু করলেন। ওই ক'বছরে আমার সংগীতের কান সারা জীবনের জন্য তৈরী করতে অপারিসীম সাহায্য করেছিলেন উনি। বিশেষ করে লোকসংগীত শোনবার কান তৈরী করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মোটামুটি ওই সময়েই খালেদ চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, গৌরীপুরের নীহার বড়ুয়া, তাঁর ছেলে ডাক্তার মৃণাল বড়ুয়া, রণেন রায়চৌধুরী ও আরো অনেকে মিলে Folk Music and Folklore Research Institute বলে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। আমি ছিলাম সেই সংস্থার কর্মী-পিঁপড়ে। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে 'Folk Institute'-এর সংগ্রহ অবিরাম শুনতাম। কখনো ছোট, কখনো মাঝারি, কখনো ঢাউস স্পুল বের করে নিজেই Ferrograph-এ পরিয়ে চালাতাম। পরে সংগৃহীত গান শুনে শুনে খাতায় লিখবার ডিউটি পেয়েছিলাম (ট্রান্সক্রিপশন কথাটা তখনো শুনিনি)। তার ফলে উত্তরবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গের প্রচুর গান মুখস্থ হয়ে গেল।

তখনো বুঝতে পারিনি যে এ সবার মধ্যে দিয়ে আমার কান তৈরী হচ্ছে।

ক্রমে Folk Institute-এর নিজের আসর বসতে লাগলো। এবং তার রেকর্ডিং Ferrograph-এ করা হতে থাকলো। প্রথমে নীহার বড়ুয়ার লেক টেরাস-এর

বাড়িতে, পরে মৃণাল বড়ুয়ার ১০ নম্বর হিন্দুস্থান পার্ক-এর বাসায়। রণেন চৌধুরী স্বয়ং গান গাইলেন, প্রতিমা বড়ুয়া আসাম থেকে এসে গান গাইলেন, বর্ধমান বেতালবনের বাউল নিতাই খেপা এসে গাইলেন। শেষমেষ কৃষ্ণনগর থেকে পুনরাবিষ্কৃত কিংবদন্তি-গায়িকা অনন্তবালা বৈষ্ণবী এসে গেয়ে গেলেন। সেটা ১৯৬৯-৭০ সাল। অনন্তবালাকে খুঁজে পাওয়া ও Folk Institute-এর হয়ে তাঁর ইন্টারভিউ নিতে যাওয়ার গল্প মৌসুমী ভৌমিক ও সুকান্ত মজুমদারের ওয়েবসাইটে আছে, পড়বেন। (<http://thetravellingarchive.org>)।

ইতিমধ্যে প্রথমে খালেদ চৌধুরী, পরে মৃণাল বড়ুয়ার কাছে ভাওয়াইয়া দোতারায় তালিম পেয়েছি; ভাওয়াইয়া, চটকা প্রভৃতি গেয়ে তার সঙ্গে বাজাতে শিখে গেছি।

পরবর্তী ১০ বছর স্পুল টেপ থেকে নির্বাসন মূলতঃ লেখাপড়ার কারণে, তার মধ্যে ক্যাসেট টেপ-এর যুগ শুরু হয়ে গেল। ক্যাসেট-এর ছেঁড়া টেপ মেরামত করতে শিখলাম, স্পুল থেকে ক্যাসেট কপি করতে শিখলাম। নতুন গান এখন ক্যাসেট থেকে শোনা এবং মাথার মধ্যে সংগ্রহ করা চলল। তখন কোথায় বা সত্যজিৎ রায় ইনস্টিটিউট আর কোথায় বা কম্পিউটার। কিন্তু কান তৈরী হওয়া তো চলতেই থাকলো।

এই সময় সোনি কোম্পানির একখানি চমৎকার কাঁধে বহনযোগ্য TC-D5M ক্যাসেট মেশিন হাতে আসে, শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলার সময় শবরী রায়চৌধুরীর বাসায় সনাতন দাস বাউল ও চিন্তামণি দাসীর গান রেকর্ড করে সেটার বউনি করলাম। আরো অনেক বাউল ও ফকিরদের গান ক্রমে ক্রমে ওই মেশিনের সাহায্যে উঠলো।

এক আদিবাসী (মুণ্ডা) মনীষীর সঙ্গে আলাপ হয়ে অকস্মাৎ আমার গানের জগতে একটা নতুন দিগন্ত যুক্ত হলো। রাঁচির সমতলবাসী ও মালভূমিবাসী মুণ্ডাদের দুটি আলাদা ভাষার গান প্রচুর পরিমাণে শোনা ও শেখার সুযোগ দিলেন অধ্যাপক রামদয়াল মুণ্ডা, অশেষ ধৈর্য্য ধরে। কিছুটা মুণ্ডারি ভাষা এবং মুণ্ডাদের আশ্চর্য্য সমৃদ্ধ তালের জগতের সঙ্গেও পরিচয় ঘটল আমার। তাঁর সাহচর্য্যে ঐ TC-D5Mটি দিয়ে সংগ্রহ হলো শহর থেকে অনেক দূরের মুণ্ডা গ্রামের নাচের আখড়ার গান, সমতলবাসী মুণ্ডাদের বৈষ্ণব-ভাবাপ্রিত রাধা-কৃষ্ণের গান এবং অনেক নাগপুরী গান। আমার কান তৈরীর কাজ এখন চলল সম্পূর্ণ অন্য খাতে।

আদিবাসী গানবাজনার ভেতর এই মধ্যবিত্ত শহরে বাঙালির প্রবেশ যে কী অসীম জাদুকরী সৌভাগ্যের ব্যাপার, তার ল্যাজামুড়ো এখনো নির্ণয় করতে পারিনি। আদিবাসী গানবাজনা হলো ব্যূহের মতো, একবার ঢুকলে আর বেরনো যায় না।

এর পরবর্তী পর্যায়ে হাতে পেলাম সোনি কোম্পানির একটি DAT রেকর্ডার। খুদে টেপ, ছোট ডায়েরির মাপের মেশিনটা সম্পূর্ণ কেসিং শুদ্ধ টেপটাকে গিলে ফেলে রেকর্ড করে, কিন্তু কানে হেডফোন লাগিয়ে সেই রেকর্ডিং শুনলে মনে হয় সামনে বসে শুনছি।

DAT দিয়ে এক দশকেরও বেশি বছর কাজ চলল—আদিবাসী গানবাজনা ও তারপর শান্তিনিকেতন পৌষ মেলার বাউল-ফকির অনুষ্ঠান। নিষ্ঠাভরে পৌষ মেলার তিন দিন সকাল বিকাল বাউল ও ফকিরি গান পুরোটা রেকর্ড করতাম। মঞ্চের নীচে মাটিতে বসে থাকতাম, DAT মেশিনটা মঞ্চের উপর বা মাটিতে রাখা থাকত, আর বুলঝাড়ার মাথায় মাইক বেঁধে খাড়া করে রেখে দিতাম। প্রত্যেক গানের প্রথম লাইন, শিল্পীর নাম আর নিবাস খেরোর খাতায় লিখে রাখতাম। মোটামুটি প্রথম থেকেই মুড়ি আর মিছরির মধ্যে তফাত করতে পারতাম। একই গান, কিন্তু শিল্পী ভেদ-এ কী অসম্ভব তারতম্য! একটা খেরো খাতা ভরে গিয়ে দ্বিতীয় খেরো শুরু হলো, বিস্তর বাউল ফকির শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ও সখ্য জন্মালো। কিছু শিল্পীকে অনুষ্ঠানের পরে আলাদা করে নিরিবিলি জায়গায় বসিয়ে রেকর্ডিং করলাম।

বছর দশেক বাদে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে লাগলো। অনেক ভালো শিল্পীকে আর আসতে দেখি না, যে বাউল গানের প্রাণই হলো ভাব, কথা ও সুর, তার জায়গায় জমি দখল করলো বাঁশি তবলা। বাইরের পেশাদারী বাঁশিওয়ালা ঢুকে পড়ে সম্পূর্ণ যাত্রার বাজনা বাজাতে লাগলেন। তবলাওয়ালা নিজের কেঁরদানি দেখাতে লাগলেন। পাবলিক বোর্ডে হাততালি দিতে লাগলেন। বাউল শিল্পীরাও নিজের গান থেকে ভাবকে বিসর্জন দিতে শুরু করলেন। practising বাউলের গান উঠে গিয়ে performing বাউলের জমানা এলো। “সোনার মান গেল রে ভাই এই বেঙ্গা পিতলের কাছে।” বুঝলাম এবার পাততাড়ি গোটানোর সময় হয়েছে।

ফকিররা কিন্তু অনেক দিন এই ফাঁদে বিশেষ পড়েননি। তাঁরা ‘ভদ্রলোক’দের কাছে পাত্তা পেতেন কম, প্রোগ্রামও পেতেন না, ফলে তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিছু কম ছিল।

পৌষ মেলার ১৪ বছরের অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং থেকে মেলায় বাউল ফকির গানের বিবর্তন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সমাজতাত্ত্বিক ও ethno-musicologist বন্ধুরা এতে আগ্রহী হলেও হতে পারেন।

আমার পক্ষে এ সবই সম্ভব হলো কৈশোর থেকে লোকসংগীতে কান তৈরীর কারণে। টেপ রেকর্ডার, DAT, মাইক—এ সব সেকেন্ডারি।

আজকাল যখন বাউল ফকির উৎসবে পাশে বসা লোকসংগীতপিপাসু শ্রোতাকে দেখি গানের কথাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খালি তাল শুনছেন এবং অসীম উৎসাহে মাথার উপর দুই হাত তুলে তালে তালে ফট্ ফট্ হাততালি দিচ্ছেন আর ডাইনে বাঁয়ে দুলাচ্ছেন, তখন তাঁদের মনে মনে বলি: কান তৈরী করুন ভাই, কান তৈরী করুন। বাংলার লোক-ঐশ্বর্য বিন্চাক মিউজিকের চাইতে অনেক ওপরে, অনেক গভীর।

সাক্ষাৎকার

I can hardly remember meeting Purna, back in 1967, when the Bauls spent some months at Albert and Sally Grossman's house in Woodstock. . . I got into the act when Garth Hudson of the Band played me a tape the Bauls had recorded at Big Pink. I talked Garth into producing the tape as an album, *The Bengali Bauls At Big Pink*, selling it to Buddah with myself as associate producer. I also wrote the liner notes. The album's a collector's item now. That's how I got into the act. . .

Under his left arm Purna holds what looks like a gourd, excepts it's a lot more than a gourd. It's an ingenious two-stringed instrument called a khamak. . The khamak is like Purna. You look at it and you have no idea what you're about to hear.

When Purna finally throws his head into the air what you immediately recognize is some of the most beautiful singing you're ever going to hear. I don't understand Purna's words but his passion is in a universal language. Everybody understands passion. Soul. This cat's got it, man!

After a few notes of this beautiful singing, you're suddenly jolted by what sounds like a symphony of percussion instruments punctuating Purna's song. You find it hard to believe that all this electrifying rhythm and cross-rhythm, all this compelling accompaniment, all this sound that sounds like an Indian cousin of any rock and roll you'd ever want to listen to---including Sheilah E's percussion-loaded music---is being played by Purna himself. How could all that sound come out of one little gourd? How could Purna concentrate on playing all those different wild rhythms at the same time he's concentrating on singing such enchanting melody?

I would've been knocked on my ass, except I was already sitting on it. Still on my ass, I slid across the floor to get closer to Purna. He had the whole room riveted. Then he started to dance. Another universal language. . .

Back home now, writing about that night, I can tell you only that there's no way to describe a performance by Purna Das. You just had to be there. You may not talk his language, but you understand him perfectly.

— Al Aronwitz, American rock journalist who called himself the 'Blacklisted Journalist'. 2002.

গান গাওয়াটা আমার নিজস্ব প্রার্থনার মতো

পার্বতী বাউলের সঙ্গে কথোপকথনে ঈশ্বিতা হালদার

পার্বতী বাউল আমাকে আমার নিজের প্রার্থনা বোধকে বুঝাতে সাহায্য করেছে। প্রথমে সেটাই ছিল, শুধু পারফরম্যান্স স্টাডিজ নয়। রিচুয়াল ও রোজদিনকার মধ্যে পার্বতীর unique অবস্থান থেকে একটা আর্ট-এর নির্মাণকে বোঝার যে চেষ্টা, সেসব এসেছে পরে। পার্বতীর গান শোনা, বা বলা উচিত তার পারফরম্যান্স লক্ষ করা বা তা অনুধাবন করা, আমার আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই।

আমাদের তো প্রার্থনাগত সাধনা নয়, সাধনা আমাদের প্রাত্যহিকের মধ্যে থাকা কোনো একটা অতিরিক্ত, যা আমি আমার নিজের ভাষায় বা ভাবে প্রকাশ করতে পারব না কোনোদিন; এমনকী তা উপলব্ধি করতেও অনেক দিন লাগত। তাকেই উস্কে দিয়েছে পার্বতী বাউলের স্বরে, 'সাধের বইয়া যায় রে দিন, আউলা সূতার টানাটানি-র পুকার আর নির্বেদ। এইরকম বোধ হয়েছিল প্রথমবার পার্বতী বাউলের অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে। সেই থেকে আমি ওকে অনুসরণ করেই চলেছি।

শক্তিগড় বাউল ফকির মেলায় মহিলা শিল্পী, সংখ্যায় কম আসেন। এই মেলায় যাঁদের শুনেছি, দেখেছি, তাঁদের মধ্যে ফুলমালাদি বা চন্দ্রাবতী মাসিমাকে ধরলে, দু'জনে যেন দু'প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। ফুলমালাদি সাধন মার্গে, দেহতত্ত্বের জটিল সংকেতময় বাণী আয়ত্তে ছিল তাঁর, অন্যজন সংসারে। কিন্তু মাসিমা গেয়ে ওঠামাত্র গোষ্ঠের গান হোক বা বিরহের, কান পাতলেই শোনা যায় সেই অতিরিক্ত। সাংসারিকতায় আচ্ছন্ন মাসিমা যার সন্ধান পেয়েছেন, অতি রমণীয় অথচ বিষাদাচ্ছন্ন কণ্ঠে গেয়েছেন যা। পার্বতীকে এই দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। যদিও তাকে শক্তিগড়ে পাইনি, পেয়েছি অন্যত্র। চোখে পরমানন্দের ঘোর, আবার ঘুড়ুরে পা কেটে গেলে অল্প মজা করে অডিয়েন্স থেকে চেয়ে নেওয়া band-aid। এত সহজ। ঘনিষ্ঠ। অথচ জটিল তাঁর শিল্পের নিজ মর্যাদায়।

সেইদিন কথা হল অনেক, প্রায় সারাদিন। সুকথক পার্বতী। সুরসিক। এখানে তার খানিক মাত্রই ধরা পড়ল ছাপার হরফে, স্বল্প পরিসরে।

সংগীত, শিল্প, সাধনা

পার্বতী।। শুধু যদি গান হত, আমি কতটা ইন্টারেস্টেড হতাম, আমি জানি না। গান তো ছিলই। হিন্দুস্তানি ক্লাসিকাল তো শিখতামই, তাছাড়া ছোটোবেলা থেকে নানা ধরনের গান শুনেছি। বাবা মা দুজনেরই খুব গানে মন ছিল। তাছাড়া কোচবিহারে বড়ো হয়েছি, তাই ভাওয়াইয়া গোয়ালপাড়িয়া এগুলো শুনে শুনেই বড়ো, কিন্তু গান যে আমি আমার জীবনের অঙ্গ করে নেব, আমার সে উদ্দেশ্য ছিল না। তবে ছোটোবেলার থেকেই জানতাম যে আমার সমস্ত জীবনটা আমি আর্টের উদ্দেশ্যেই দেব। মা খুব ভক্তিব্রবণ ছিলেন। আমাদের বাড়ি সকালে আর সন্ধ্যায় কথামৃত পাঠ হত। এত শুনেছি যে কথাগুলো আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কথামৃতের মধ্যে অনেকগুলো গানই বাউল গান। মা মাঝে মাঝে নিজেই ওগুলো সুর করে গাইতেন। যেমন আমার মনে আছে ‘ডুব ডুব ডুব, ডুবসাগরে আমার মন’।

বাবা চেয়েছিলেন আমি নাচ করি। কিন্তু আমি চাইছিলাম সম্পূর্ণ স্বাধীন একটা ব্যাপার। আমি কেমন যেন আঁটো ব্যাপারটার মধ্যে থাকতে পারতাম না। দম ঘুটে আসত। কিন্তু হয়তো গুরুর সান্নিধ্যে গুরুকুলের মতো করে শিখেছি বলে আমার মধ্যে গুরুর প্রতি এই ভক্তিটা এসেছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতের মধ্যে দিয়ে যে স্বাধীনতা পাওয়া যায়, সেই স্বাধীনতা অন্যান্য স্বাধীনতা থেকে একদমই যে আলাদা, আমি এটা পরে বুঝেছি। ওই জায়গাটা বাউল আমাকে দিতে পেরেছে। যখন বাউলের গান শুনেছি সেই গলার মধ্যে বাঁধাধরা কিছু নেই, একদম উদার মনে গান গাওয়া। তার মধ্যে যে স্বাধীনতা আর আনন্দ আমি দেখতে পেয়েছি, কেউ কেউ হয়তো যে কোনও আর্ট ফর্মের মধ্যে এই স্বাধীনতা আর আনন্দ পেতে পারেন, কিন্তু আমার জীবনে আমি বাউলের মধ্যে এটা পেয়েছি।

সনাতন বাবা, যখন দেখেছি, কলাভবনে গান গাইতে এসেছেন। বাবা গাইছিলেন আর আমি সব চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি তখন ছবি আঁকা শিখছিলাম আর মনে হচ্ছিল সনাতনবাবাও ছবিই আঁকছেন, অদৃশ্য ছবি। সেটা আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। মনে হয়েছিল এটা তো আরও থ্রেটার আর্ট। তখন মনে হয়েছিল এই মানুষটার অন্তর কেমন। অনেক বাউল আমি দেখেছি কিন্তু উনি যখন গান গাইতেন, তখন ওঁর চারপাশে একটা আলো তৈরি হত। ওইটা উনি কী করে করেন। অনুষ্ঠানের পর আমি পিছু পিছু গেছি। চা নিয়ে গেছি। চা দিতে গিয়ে খুব কাছে থেকে ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। জ্বলন্ত চোখ ছিল বাবার, একেবারে পেনিট্রেটিং। ভেবেছি কী সাংঘাতিক শক্তি লোকটার। তারপর আবার সব ভুলে টুলে ছবি আঁকতে শুরু

করেছি। তারপর যখন একটু একটু বাউল গাইতে শুরু করেছি যেমন সবাই করে কলেজে থাকতে, একতারাও শিখছি, একতারা হাতে গাইছি। ফুলমালাদির কাছে গেলে উনি আবার কন্ডিশান দিয়েছেন যে, ‘তোমাকে গান শেখাতে গেলে আমার সময় নষ্ট হবে, তা যখন আমি ট্রেনে গান করি, তুমি যদি আস আমার সঙ্গে। আমি যখন গাইব, তুমি পেছনে পেছনে গাইবে, সেভাবে তুমি শিখে নেবে।’ দ্যাখ, এতক্ষণ পর্যন্ত খুব সুরক্ষিত পরিবেশে বড়ো হচ্ছিলাম বাবা মায়ের আদর প্রোটেকশানে, এই প্রথম আমার জীবনের অভিজ্ঞতা হল। যেসব আমি ভাবতেই পারতাম না, সেসমস্ত জায়গায় যাওয়া হল এই প্রথম। যারা ট্রেনে হকার, চা বিক্রি করেন, তাদের বাড়িতে যাওয়া সেসব আমাকে অনেক শিখিয়েছে। আর ফুলমালাদির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে যেটা আমি অবজার্ড করেছি সেটা হল এই ঘুরে ঘুরে গান গাওয়া শুধু পয়সা রোজগারের জন্য নয়। ফুলমালাদি অন্য কাজও করতে পারত। একদিন ফুলমালাদি একটা ঝোলা বের করেছে, এরকম চৌকো। উনি বললেন, এটা সিদ্ধির ঝুলি। চারটে কোণায় স্থূল প্রবর্ত সাধক সিদ্ধ। উনি বললেন, ‘তুমি বাউল গান গাইছ আর বাউলের জিনিসগুলোই জানো না।’ আমি বললাম না, আমার শুধু বাউল গান ভালো লাগে। তখন ওইসব জ্বলাইয়া গেলা মনের আগুন নিভাইয়া গেলা না—এইসব রোম্যান্টিক গান ভাল্লাগছে (হাসি)। ফুলমালাদি বললেন যে ভেতরটা বুঝতে হবে। ফুলমালাদি বললেন, ‘আমার তোমাকে দীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, তোমাকে গুরু খুঁজে নিতে হবে।’ সেই কারণেই সনাতন বাবার কাছে যাওয়া। কিন্তু আমি যে এই গান গাই, এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি শুরু হয়েছে। এখন যেমন একটা জায়গা থেকে আর একটা জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছি গান গাওয়ার জন্য, আমি কিন্তু শুরুতে এরকম কিছু ভাবিনি। আমার উদ্দেশ্য ছিল বাউল, তার যে সাধনা সেটা থেকে আনন্দ পাওয়া। যখন বাউল করতে শুরু করেছি তখন তো কেউ মেনে নেয়নি, আমাকে তো বাড়ি থেকেও তাড়িয়ে দিয়েছে। কোনও বন্ধু ছিল না, কেউ স্বীকার করে নেয়নি।

পিওর আর্ট ফর্ম বনাম সাধনা

পার্বতী।। আমার মধ্যে যে কনফিউশান তৈরি হয়নি একথা বললে একদম ভুল বলা হবে। আমার মনে হয়েছিল যে সাধনাই যদি আমার পথ হয়, তাহলে আমি হিমালয়ে চলে গিয়ে একা একতারা বাজিয়ে গান গাইতেই পারি, আমার ঘুরে ঘুরে মানুষের কাছে গিয়ে গান গাওয়ার কী দরকার। তখন সনাতন বাবা

বললেন যে, ‘তুই বাউল, গানের মাধ্যমে নিজের মাধ্যমে বাউলের কথা জানানোই তোর কাজ।’ সাধারণের কাছে একটা জিনিসের যা মানে, বাউলের কাছে তা একেবারে আলাদা। সেটা জানাতে চাওয়াও আমার সাধনার একটা অংশ। বাবাই আমাকে বললেন তুই তাহলে যা, লোকের কাছে ছড়িয়ে দে। আমি বললাম যে কী করে যাব। শুনে দশ টাকা দিলেন (হাসি)। বললেন, ঠিক চলে যাবি। দ্যাখো তারপর তো এত জায়গায় গেলাম। আমি কিন্তু কাউকে কোনোদিন বলিনি। এমনি ডাক এসেছে। আসতে থেকেছে। আমি নিজে বলিনি আমি ওখানে যেতে চাই। আমি শুধু বলেছি আমি আত্মনিবেদন করতে রাজি আছি। বাউলের কাছ থেকে আমি এত পেয়েছি, তা যদি আমি বলতে পারি তাহলে একটু সেবা করা হয়। কিন্তু এতে আমার হাত নেই, এটা একটা সময়। সেই সময় কাউকে তার মাধ্যম করে নেয়। এ সবই গুরু মহাজনদের, আমাকে ওঁরা মাধ্যম করে নিয়েছেন। আমার অনেক সময় মনে হয়েছে এতরকম জায়গায় গান গাইছি, সফিসটিকেটেড থিয়েটারে বা খুব এলিট জায়গায়, আমার তো পথে বা আশ্রমে গিয়ে গাওয়ার কথা... তারপর মনে হয়েছে সবই তো মানুষের জন্য গাওয়া। ইনিশিয়েটেড না আন-ইনিশিয়েটেড প্রত্যেকের কাছেই পৌঁছনো দরকার। আমি প্রিচ তো করছি না, যে এটাই একমাত্র, এটাই সত্যি আর তোমাকে এই পথই নিতে হবে। যারা বাউল ভালোবাসে তারা ডাকলে আমি যাব, যেমন আমি সায়েন্টিস্টরা ভালোবেসে ডাকলে গেছি, ফেমিনিস্টরা ডাকলেও। যারা জেভার নিয়ে কাজ করেন, এসব তাঁদেরও ছোঁয়। কারণ বাউল সেই স্বাধীনতার কথা বলে। নারীপুরুষের, ধর্ম, জাতপাত সব কিছুই বাইরে যাওয়ার কথা বলে বাউল। আমি গ্রামেও গান গাই, আখড়াতে, সেখানেও একই কথা বলা হয়।

সাধক বনাম কনটেম্পোরারি

পার্বতী।। আমার মনে হয় গানের মধ্যে সেই যে একটা ভাব বা উপস্থিতি সে তখনই উপলব্ধি করতে পারে যখন তার অন্তর একদম শুদ্ধ। সে তখনই গানের মধ্যে দিয়ে ওই অন্য জগতের উপস্থিতি ফুটিয়ে তুলতে পারে যখন তার মন একেবারে পরিষ্কার। কাজেই আমি যদি এখন প্রিটেন্ড করি যে আমি একজন পুরনো দিনের মতো সাধক, তা তো নই। আমি তো পড়াশুনো করেছি একটা কনটেম্পোরারি জায়গায়, কলাভবনে। কনটেম্পোরারি আর্ট শিখছিলাম। আমি থিয়েটার করেছি। আমি পলিটিক্যালি অ্যাওয়ার। আমি তো কোনও কিছুকেই

অগ্রাহ্য করিনি। আমার দেশ দেখতে ভালো লাগে। আমার বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে আলাপ করতে ভালো লাগে। সহজাত। এইটা সনাতন বাবা সবসময় বলতেন। সহজাতের মধ্যে প্রিটেন্ড করার কোনো জায়গা নেই। আমি এই সময়ের মানুষ, আফটার অল। আমি যে বাউল গান অনুভব করছি, আমি তোমাদের মতো করেও অনুভব করছি। আমি যেহেতু ওঁদেরকে বুঝতে পারি, আমায় এই সময়ের লোককেও বুঝতে পারি। গান গাওয়াটা সেখান থেকেও হয়।

পারফর্মার ও অডিয়েন্স

পার্বতী।। যে গানগুলোয় সাড়া আসে ভেতর থেকে সেগুলোই গাই। এটাও আবার সেই সহজাত, যেটা সহজে আসে। কেউ আবার গাইতে বললে আমি গাইতে পারি না। এইটা গাও ওইটা গাও বললে আমি ভালো করে গাইতে পারি না (হাসি)। আমার এরকম হয়েছে যে আমি কোথাও পৌঁছেছি, রাতে গান করেছি, সকালে ব্যাকপ্যাক গুছিয়ে আবার অন্য জায়গায় গেছি, বাস্তু খুলেছি আবার গান গেয়েছি। এই যে কনটিনুয়াস জার্নি, তার মধ্যে গান গাওয়াটা আমার নিজস্ব প্রার্থনার মতো। তার সঙ্গে অন্যরা আছেন। এইটুকুই কোনও বিশেষ অডিয়েন্সের জন্যে গাইছি এরকম নির্দিষ্ট নয়। কিন্তু ডেফিনিটলি আমি মানুষকেও অগ্রাহ্য করতে পারি না। আগে আমি খুব অ্যাফেকটেড হতাম। পজিটিভলি সেখানে গান ভালো হত। যেখানে বুঝতাম একটু অবজারভেশন চলছে (হাসি), সেখানে গান অতো ভালো হত না। কিন্তু এখন পজিটিভ কী নেগেটিভ আমি নিজেই কন্ট্রোল করতে পারি। যে শুনবি না মানে, শুনতেই হবে (হাসি)।

রেওয়াজ, সাধনা, প্রাত্যহিক

পার্বতী।। অনেক ক্ষেত্রে হয় আমার কাছে যারা শেখে তারা আমার কাছেই আমার বাড়িতে থেকে শেখে। আমরা সবাই মোটামুটি তিনটে নাগাদ ঘুম থেকে উঠি। উঠেই আমরা চা খেয়ে নি (হাসি)। তারপর আমরা প্র্যাকটিস করতে যাই। আমরা সবাই একসঙ্গে যোগাভ্যাস করি। তারপর খানিকটা সময় নিজের নিজের সময়। তারপর কাজ গোছাই। কী রান্না হবে বলে দিই, কে কী করবে সব ঠিকঠাক করে দিই। তারপর একটুখানি ব্রেকফাস্টের পর ঘণ্টাখানেক শেখাই। তারপর পুরো সময়টাই আমি নিজের কাজে লাগাই। যতটা সময় গান কম্পোজ করা যায়, গান নিয়ে ভাবা যায়, আমি তাই করি। পুরো সময়টা নিজে কাজ

করার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে ঠিক করে নিই, এসময়টা আমি কারো সঙ্গে দেখা করব না, সাইলেসে থাকতে চাই বা কোনও নিয়ম পালন করতে চাই, তখন আমি একা থাকি।

মেয়ে, মহিলা বাউল, শিল্পী

পার্বতী।। আমি ছোটবেলা থেকে কোনোদিন ভাবিনি যে আমি মেয়ে আর মেয়ে বলে আমার এইভাবে চলা উচিত। বা ছেলে হলে এই এই করতাম। এটা রিয়েলাইজ করতেই টাইম লেগে গেছে যে আমি মেয়ে। তারপর সনাতন বাবার কাছে গেছি, শশাঙ্ক গোস্বায়ীর কাছে গেছি, তখন যেটাকে বলে হৌঁচট লাগা, সেটা হয়েছিল। তুমি তো মেয়ে। তুমি কি পারবে? তোমার তো বিয়ে হয়ে যাবে। সন্তান হবে। তাদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবে। তুমি নিজেকে উৎসর্গ করতে পারবে না। আমার সময় নষ্ট হবে। এটা প্রথমে শুনতেই হয়েছে। আমি বললাম, ঠিক আছে। আমি তাহলে সব ছাড়লাম। কিন্তু প্রথমে যখন অতকিছু জানি না, গাইতে গেছি যখন, দেখেছি পুরুষরাই সবটা দখল করে আছে। বা অনেক সময় দেখেছি পুরুষদেরই একমাত্র বলবার অধিকার আছে। আধ্যাত্মিক জগত সম্পর্কে। অনেক জায়গায় আবার এরকমও হয়েছে যে আমি গাইতে উঠেছি, কিন্তু যারা বাজাচ্ছে, তারা ইনস্ট্রুমেন্ট চেঞ্জ করছে না। দ্যাখো তাতে অসুবিধে কী হয়। মেয়েদের গলা এমনিতেই ডি বা সি-তে থাকে। ছেলেরা জি বা এফ-এ গায়। আর বাজনাও সেই অনুযায়ী বাঁধা থাকে। কিছুতেই তারা বদলাবে না। আমি ঠিক করলাম, ঠিক আছে আমি ছেলেদের স্কেলেই গাইব। গলা ভেঙে যেত, কিন্তু বছরের পর বছর আমি সেভাবেই গেয়েছি।

এখন অবশ্য আমাকে কেউ নারী টারি বলে ভাবে না। এখন যথেষ্ট সম্মান ভালোবাসা পাই। কিন্তু সেটা একদিনে হয়নি। কিন্তু আর যারা মহিলা বাউল রয়েছেন, তাঁরা যে এই জায়গাটা পান আমি তা বলতে পারি না। সব ক্ষেত্রেই বাউলের আখড়া বা আশ্রমের অধিকাংশ কাজ, তার রক্ষণাবেক্ষণ করেন সেবাদাসীরাই। কিন্তু তাঁরা কতটা স্বীকৃতি পান? তবে একটা জিনিস হয়েছে যে মাথায় জটা আছে বলে আমাকে অথেনটিক আধ্যাত্মিক বলে মনে হয় যে কারণে এমনি সাধারণ জায়গায় মহিলা বলে আমাকে কেউ কখনো অ্যাপ্রোচ করেনি।

কিন্তু একবার আমার হয়েছিল মুর্শিদাবাদের একদম ভেতরে এক ফকির বাবার আশ্রমে যাওয়ার সময়। বাংলাদেশ বর্ডারের কাছে। খুঁজতে খুঁজতে একটা পাড়া দিয়ে যাচ্ছিলাম যেখান গান বাজনাকে হারাম ভাবা হয়। সেখানে একজন

মহিলা যার চুল খোলা, মাথায় কোনো ঘোমটা নেই, একতারা হাতে নিয়ে যাচ্ছে এটা ওদের ভালো লাগেনি। প্রচুর অ্যাকুইজিশান ওরা আমাকে করেছিল। আমি বললাম, তোমরা যার প্রার্থনা করো, আমি তার গানই গাই। তোমরা এসে দেখো আমি কোনও অন্যায় করছি কি না। তারা এসেছিল এবং নিঃশব্দে ফিরে গেছিল। আর একটা কথা, আমি যখন শুরু করেছি তখন যারা গুরু সনাতন বাবা আর শশাঙ্ক গোসাঁই এদের ধ্যান আর ধারাই আমি মেনে চলতাম। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্পেশাল মহিলার সংস্পর্শে আমি এসেছিলাম, তাঁদের অভিজ্ঞতা আর জ্ঞান আমি মেনে চলেছি, নারী হিসেবে নিজের অনুভূতি বুঝতে পেরেছি।

বাউল গানে যেমন আছে, ‘মন তুমি পুরুষ কি নারী, প্রকৃতির স্বভাব ধরো, সাধন করো, উর্ধ্ব হবে দেহের রতি’। এখানে নারী বা পুরুষ কী? একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সবসময় মহিলাদেরই সারেভার করতে হবে কেন? রাধা সীতা এদের মুখ দিয়েই কেন? পুরুষের গলা নেই কেন সারেভার করার? আমি বলেছি যখনই পুরুষ সারেভার করবে, সে তখন নারী হয়ে যাবে। নারীর সারেভারটা উইকেনেস নয়। আর কথার অনুসরণ করা বা বাধ্যতা এটা সারেভার করা নয়। সারেভার অন্তরের একটা উপলব্ধি। আত্মনিবেদন। যাতে একটা মানুষ বিশাল হয়। পৌরুষ আসলে একটা প্রতীক। যেটা ইগো। অহং। মানুষের মধ্যে যে জয় করবার ইচ্ছে, অন্যের দখল নেওয়ার ইচ্ছে, সেটা পৌরুষ। নারীর মধ্যেও আছে, পুরুষের মধ্যেও আছে। ভালোবাসা, প্যাশান, আত্মনিবেদন, যত্ন নেওয়া এগুলো নারীত্ব। এগুলো গুণ। বাইরে কে নারী কে পুরুষ তার সঙ্গে নারীত্ব বা পৌরুষের কোনো সম্পর্ক নেই। বাউলও এই বাইরের নারী পুরুষের বাইরে ভাবে।

ঈঙ্গিতা হালদার লেখক, গবেষক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক।

ଘରୁଜୀ ଜହାଁ ବ୍ୟାୟଟୁଁ ଓୟହାଁ ହାୟାଁ ଜୀ

... We visited the temple under the banyan tree. According to Kees [Bake's wife Cornelia] the fruits etc put on the copper plate were shaken off with the collected cents, but I didn't see this, and I don't know if it is true, and if it is, it didn't help because you can't say 'I'm sorry, I won't eat off your cent plate.'

Under the banyan tree everything had started happening. There is an awful lot of wheat under the chaff, and the first day it was quite hard to separate the chaff from the wheat. We didn't hear many good things—a sadhu who acted (or whined) as if possessed, which he wasn't, and so on. But what was very nice was a dancing woman, with a man, not sadhus but common people from the lower caste of the Bankura district, who sang funny songs and danced to them while the drums played. By half past 12 we were home ... at the temple there was endless namsankirtan—singing god's name—accompanied by some dancing and sitting on the ground, then the Gitagovinda, which was interesting and nice. In style it was not very different from other the kirtan that I have heard on different occasions. Rhythmically remarkable, though, and musically at times worth listening to as well. Though very tired, we went again to the banyan tree. Walked to the camp; there were many asleep, some were sitting around fires, reciting. Some dancing (but not very well). At one little camp a man was playing the flute beautifully, without noticing the world around him, on a bamboo flute. He went quiet, then someone else sang a song. Also very wonderful. To my surprise they allowed us to come back to record them the next day. I was thrilled. It was the first truly good thing we had heard.

Other than that we saw and heard many other good things that night. There was an old man in a long white night robe who sang beautifully, and another, Ghanashyam, who danced wonderfully. My discovery was a man called Hari Das. Utterly content, we returned to the tents at about half past twelve ...

This young man Bhattacharji joined us at the temple. The magistrate [Gursaday Datta] went for a nap. It was very quiet, now I could experiment all I wanted, and that was hard enough, because the leader of the singers had a rather weak voice, due to which I had to spend six ... to fill three rolls, that of course I can scrape off here and use again. We had, however, invited the other singers to our tent at four, and it was getting more and more late. Mr Datta also showed up and when I was finished with work, we had to drink tea from the mahant, which we couldn't possibly refuse because we had more or less promised this in the morning. Therefore we returned as late as half past 5 to the tent camp, where Kees came to me desperately, saying that they had

been here for so long, and were so cold. Fortunately I could record everything I thought I could, though I would have liked to have done more. One of the songs to which the woman danced (the one from Bankura) and other than that the baul song that we had heard the first night in the temple, and finally the flute playing of Hari Das 'khaepa' as he calls himself, the lost one, and a few songs of his comrade who had sung the previous night as well, and also another song of his and of a girl who belonged to the lot as well . . .

— From Dutch ethnomusicologist Arnold Bake's letter to his mother, written on 20 January 1932, after returning to Santiniketan from Kenduli.

শ্রাদ্ধ চুকে গেছে কিন্তু ঘোষঠাকুরের মন্দিরের সামনে ভিড়ের শেষ নেই। থিকথিক করচে মানুষ। মেলার ব্যবস্থাপনা এখন নদিয়ারাজ বা জমিদার মল্লিক বংশের হাতে নেই। চলে এসেছে পঞ্চায়েতের হাতে। তারাই মেলার দোকানের বিলিব্যবস্থা করছে। রোজগারও মেলা কমিটির। বেশ কিছু দক্ষিণা মিলে যায় পূজারী মুখুজ্যে বংশের কপালে। আমি আর ভক্তপ্রসাদ আচার্য ঘুরছি মেলার চারপাশে। গোপীনাথের মন্দিরের সামনে বিখ্যাত তমালতলার শানবাঁধানো চত্বর। তাতে নানা দলে ভাগ হয়ে বসে আছে বাউল বৈরাগীদের দল। গাঁজা টানা চলছে কোথাও কোথাও। মহিলা বাউল মীরাবাইয়ের আসর জমজমাট।

—‘দেবতার লোকায়ন: অগ্রদ্বীপের মেলা’, সুধীর চক্রবর্তী।
উৎসবে, মেলায়, ইতিহাসে (২০০৪) বই থেকে।

২০১৫ সালে, বাউল ফকির উৎসবের দশম বছরে আব্দুল হালিম ফকির, মনসুর ফকির এবং রাধেশ্যাম দাস বাউলকে সম্বর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।

আব্দুল হালিম ফকির

বীরভূম জেলার রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে ১৯৫৯ সালে আব্দুল হালিম ফকিরের জন্ম হয়। বাবা আনসার আলি, মা জানেচ্ছা বিবি। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে ডুবকি বাজিয়ে ফকিরি গান গাইতে শুনেছেন। সংগীত জগতে হাতেখড়িও বাবার হাতে। দীক্ষাগুরু হিসেবে তারাপীঠের জব্বর চিস্তির আশীর্বাদধন্য হালিম ফকির। বাঁয়া, একতারা নিয়ে গান গাইতে শিখলেও দোতারা শিক্ষায় গুরু হিসেবে পেয়েছেন শহরত আলি বিশ্বাসকে। তাঁর শিক্ষাগুরু বাংলাদেশের হজরত খাজা মনসুর আল চিস্তি। রুজির টানে বার-তেরো বছর বয়সেই ট্রেনে গান গেয়েছেন। আবার বেলুড়ের লালবাবার আশ্রমে টানা আড়াই বছর কাটিয়ে গান গেয়েছেন। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর সাধনার পথে অন্তরায় হয়নি। দোতারায় তাঁর শৈল্পিক দক্ষতার পাশাপাশি হালিম ফকিরের গলায় জব্বর চিস্তি এবং মনসুর আল চিস্তির বিরল সংগ্রহ শোনার অভিজ্ঞতা বাংলা গানের সম্পদকে করে তোলে আরো ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

মনসুর ফকির

জন্ম নদীয়া জেলার থানার পাড়া এলাকার গোড়ভাঙা গ্রামে। মা মোহবা বেওয়া। বাবা আজাহার ফকির। মা বিয়ের গানের সঙ্গে নাচে পারঙ্গম ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে একতারা ও ডুগি বাজিয়ে ফকিরি গান গাইতে দেখেছেন। এই আবহে খুব কম বয়সেই গান শুরু করেন মনসুর ফকির। গানে হাতেখড়ি বাবার কাছে। পাশাপাশি শিখেছেন জুড়ি, করতাল, খোল, খমক, ডুবকি দোতারার মতো একাধিক বাদ্যযন্ত্র। তার শিক্ষাগুরু ইলাহি বক্স। দীক্ষাগুরু ইমান পণ্ডিত। সারা জীবন ধরে দুই বাংলার বেহাল শাহ, করিম শাহ, মকবুল শাহ, ননীবালা, আজাহার ফকির, সোলেমান ফকিরের মতো বিভিন্ন সাধক-শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সাধনাকে করে তুলেছ আরো গভীর। ঝাড়ু কোলের কাছে দোতারা শিক্ষা মনসুর ফকিরের গানের বিস্তারকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। বিশেষত দোতারা সহযোগে তাঁর ফকিরি গান গ্রাম-শহরের রসিককে উদ্বেল করে তোলে।

আমিকে খোঁজা

গৌতম ভদ্র

বর্তমানের আমিটা কি অতীতের আমি? বদলালে কী বদলেছি? আগেরটাই বা কতদূর আছে? আগের আমিকে বর্তমানের আমি চিনব বা বুঝব কী করে? চিনতে চাইবই বা কেন? বোঝা বা জানাটা তো চৈতন্যের কাজ, মননের কর্ম। এই চৈতন্যের ক্রিয়াশীলতা কি? কীভাবে বর্তমানের আমিটা অতীতের আমিকে ছোঁবে?

এই জানা বা বোঝার তাগিদের মধ্যে ‘অহং’-এর বোধ আছে, কোনো না কোনো আত্মধারণা কাজ করে। এই আত্মধারণার একটি প্রকাশ তো স্মৃতিকণ্ঠয়ন, স্মৃতিচারণ ও স্মৃতিকথন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও নাগরিক সমাজে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের একটি স্বীকৃত রূপই আত্মজীবনী রচনা, আত্মকে উপস্থাপন করে আমিটাই আমার রচনার বিষয় হচ্ছি, আমিত্বকে কোনো না কোনো কারণে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি। কেউ না কেউ শুনবে, পড়বে বা কারুর না কারুর কাজে লাগবে, এই ধরনের প্রত্যাশা কাজ করে। অন্য আমি নানা আমিকে নিজের কাছে নিজেকে ব্যাখ্যা করতে পারি, এটাও মনে হতে পারে। ‘আপনাকে এই চেনা’ আমার তো কখনোই ফুরোয় না।

অবশ্যই যে কোনো আমি নিরালম্ব নয়, তার সমাজ কায় আছে, দেশ ও কালের বোধে সেই আত্মবোধ নিষিক্ত। গোষ্ঠী চৈতন্যভেদে সেই বোধের প্রকাশও ভিন্ন। পূর্বাশ্রমের কথা বলা তো যে কোনো যতি বা সন্ন্যাসীর নিষিদ্ধ, কোনো কোনো সম্প্রদায়ে নিজের পিণ্ড নিজে দিয়ে সাধক সম্প্রদায়ে দীক্ষা নিতে হয়। আত্মবিলোপ না করে কি ব্রহ্মতে বিলীন হওয়া যায়? আবার কোনো কোনো সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসী ১২ বছর বাদে পিতা, মাতা বা পূর্ব পরিবারকে শেষ দেখা দিতে একবারের জন্য প্রত্যাবর্তন করেন। বোধি প্রাপ্তির পরে সিদ্ধার্থ একবারের জন্য কপিলাবস্ত্রতে ফিরে গিয়েছিলেন, রাহুলমাতার হাত ধরে রাহুল বুদ্ধের কাছে পিতৃধন প্রার্থনা করেছিলেন, এই কাহিনি কত যে গাত্রচিত্রে বা বৌদ্ধ কথায় আবৃত্ত হয়েছে, তার শেষ নেই। এই আবৃত্তির সুর অবশ্যই ভিন্ন, প্রাচীন চিত্রায়ণে শাস্ত্রার করুণা ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য ধ্বনিত হয়েছে, আধুনিক চিত্রায়ণে ধরা পড়েছে বুদ্ধের করুণ ও মানবিক মহত্ত্ব।

সংসার ত্যাগ ও ফেরার মধ্যে স্বীকার ও অস্বীকারের টানাপোড়েনের অভিজ্ঞতার এক অনন্য দলিল সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন জান ওপেনশ (Jeanne Openshaw)। অনন্য এই কারণে যে ত্রীপদীতে লেখা ২৯ পৃষ্ঠার এই

আত্মজীবনীটি রাঢ়ের এক বাউলগুরু রাজকৃষ্ণ স্বামীর (১৮৬৯-১৯৪৬) লেখা, তাঁর আশ্রমে পুঁথির আকারে সংরক্ষিত ছিল। আত্মজীবনীটি অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নয়। কোনো বাউলগুরুর এই ধরনের পূর্বাশ্রম সম্পর্কে আত্মজীবনী এতাবৎকাল একটিও পাওয়া যায়নি, এইটি আবিষ্কারের পূর্ণ কৃতিত্ব ওপেনশর পাওনা। এই পুঁথিটি তিনি ছাপিয়েছেন, পাঠটি বিন্যস্ত হয়েছে রোমান অক্ষরে। এই পাঠের সঙ্গে ইংরেজি অনুবাদ, নোট, নানা তথ্যসংকলন ও নিজের বিচার-বিশ্লেষণ যোগ করে তিনি নাতিদীর্ঘ একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, নাম *Writing the Self: The Life and Philosophy of a Dissenting Bengali Baul Guru*. New Delhi: Oxford University Press, 2010। আর্কাইভগত অনন্যতা ছাড়াও উপস্থাপনার গুণে ও চিন্তার নিজস্বতায় এই স্মৃতিচারণটি অহং-এর কালচেতনার এক মাত্রা-নিদর্শনের সাক্ষ্য দিতে পারে, অতীত ও বর্তমানের মিলমিশের স্বতন্ত্র নকশা তৈরি করে।

বলে নেওয়া ভালো যে ওপেনশ-র পাঠের সঙ্গে আমার পাঠের ধাঁচ নাও মিলতে পারে। ওপেনশ বাউল সাধনার বিশেষ ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে এই স্মৃতিকথাটি পড়েছেন। ফরাসি সমাজতাত্ত্বিক লুই দ্যুমোর প্রভাবশালী মতটি তিনি একদম স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, এই থাকবন্দী ভারতীয় গ্রামীণ গোষ্ঠীসমাজে ব্যক্তিমানুষের স্ফূরণ হওয়া সম্ভব, ব্যক্তি হিসেবেই মানুষ আত্ম বনাম সমাজকে বিচার করে, এটি এই সাধারণ বাউলগুরুর স্মৃতিকথাটি পড়লেই বোঝা যায়। দ্যুমো বর্ণিত গৃহস্থ বনাম বিরক্ত বৈরাগী বা ত্যাগী (renoucer)-এর দ্বিকোটিক বিভাজনকে চূড়ান্ত বলে মানতেও তিনি নারাজ, অসংখ্য বাউলের মধ্যে তিনি এই দুইয়েরই মিশেল দেখেন। বলতে কী, তিনি 'বাউল' শব্দটি বড় একটা ব্যবহার করতে চান না, এটিকে নানা নিম্নবর্গীয় সাধকগোষ্ঠীর প্রতি বাইরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রযুক্ত শব্দ বলে তিনি মনে করেন। তাঁর কাছে 'বর্তমানপন্থী' কাম্য শব্দ। বাউল অর্থ 'পাগল' বা 'বেখান্না' নয়। বরং তাঁরা বর্তমান বা প্রত্যক্ষের সাধক, অনুমানের বিপক্ষে; নিজের ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও বুদ্ধিই বাউলদের কাছে গ্রাহ্য, তাঁরা পরতন্ত্রজীবী নন। এই দার্শনিক চিন্তাই জ্ঞান ওপেনশর আলোচনাকে ঋদ্ধ করেছে। তাঁর যুক্তি সাজাতে ওপেনশ রাজকৃষ্ণ বা রাজ খেপার প্রায় দুশটি বাউল গান উল্লেখ করেছেন, একাধিক শিষ্য-প্রশিষ্যের রচনা ও সাক্ষাৎকারও নিয়েছেন। তাঁর সম্মুখে বাংলার একটি এলাকার এক বাউল/বর্তমানপন্থী গুরু ও তাঁর পরম্পরার সামগ্রিক ইতিহাস, আত্মের চর্চা এই ভাবেই তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছে।

আমার পাঠের উদ্দেশ্য সীমিত, মূল পাঠ্যবস্তুও একটি, কেবল রাজ খেপার জীবনচরিত। ওপেনশ-র মতে প্রথম ২৫ পাতার আখ্যান গোটা গোটা ছাঁদে লেখা। ১৯০৬-১৯১২ রাজ খেপা নদীয়ায় ছিলেন, থিতু জীবন, তার ছাপ আছে নিটোল অক্ষরে। পৃষ্ঠা ২৬ থেকে কাহিনি অন্যদিকে মোড় নিয়েছে, অক্ষরের ছাঁদও বদলেছে, ভাষাও এলোমেলো। ওপেনশ-র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এই শেষ পাতাগুলো পরের রচনা, ১৯১২ সালের পরে, কারণ এই পৃষ্ঠাগুলির বিষয় রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে রাজের প্রেম ও পলায়ন। তিন পৃষ্ঠার মধ্যেই জীবন অভিজ্ঞতা বর্ণন হঠাৎ শেষ হয়েছে। এই কাঠামোর ভাগটির গুরুত্ব আছে; প্রথমটি বড় গোছানো, দ্বিতীয়টির অনুভূতি তীব্র কিন্তু ঘটনা পরম্পরা ছাড়াছাড়া। এই বৈপরীত্যটি অহং-এর উপস্থাপনার ঘোষণা ও অবলুপ্তির জন্য রাজের কাছে জরুরি ছিল। কারণ, দুই অভিজ্ঞতার মাত্রা দুইরকম, ঘোষণা ও অবলুপ্তির গতয়াতটির চরিত্রও তো অন্যরকম।

আত্মজীবনীর প্রথম অংশটা যেন পটদৃশ্য, রাজ খেপা বলে যাচ্ছেন, নিজে দেখছেন, অন্যদের দেখাচ্ছেন। তাঁর পূর্বাশ্রম একেবারে কালিক, তারিখ ধরে অতীত বর্ণনা চলছে। রাজের জীবনচরিতে মাঝে মাঝেই তারিখের উল্লেখ আছে, জায়গায় জায়গায় তারিখের শোধনও আছে। রাজের পরিবার শিক্ষিত, ইংরেজ অফিস-কাছারির সঙ্গে যুক্ত, নির্দিষ্ট দিনের গুরুত্ব বা অফিসি রোজনামচার সঙ্গে রাজের পরিচয় জন্মাবধি। বিংশ শতকের গোড়ায় লেখা এই আত্মজীবনীতে দিনক্ষণের উল্লেখ ও ব্যবহার আদৌ বিচিত্র নয়। কিন্তু এই দিনক্ষণের ব্যবহার পয়ার ছন্দের মধ্যে একটি কালিক দূরত্ব আনে, আবার ঘটনাও নির্দিষ্ট করে। অতীতের খুঁটি মজবুত হয়, তবেই তো বর্তমানের সময়নিষ্ঠ প্রেক্ষিত তৈরি হয়। বর্তমানের আমি অতীতের আমিকে দিনক্ষণ মিলিয়ে দেখছে, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। স্মৃতিকথার গুরুটা এইরকম,

‘শ্রীহট্ট ডিস্ট্রিক্ট আছে আসাম বিভাগে।

পঞ্চখণ্ড বলি স্থান তার পূর্বভাগে।।

তার মধ্যে আছে সুপতলা গ্রাম।

গ্রামের মধ্যে ছিল মম পূর্ব ধাম।।

কুলচন্দ্র মিশ্র নামে বৈদিক ব্রাহ্মণ।

তারি ওরসে চারি পুত্র যত ধন।।

কালি বলে নাম ছিল সকলের জ্যেষ্ঠ।

মন তাত ইনি তিনি তাহার কনিষ্ঠ।।

‘‘ৰেবতী ৰমণ মিশ্ৰ হন মম পিতা।।’’

হইল আমার জন্ম বলেছেন পিতা ।।’

জন্মিলে মৃত্যু কারো এড়াবার নয়।’

পট ঘোরে, দৃশ্য উন্মোচিত হয়, দুঃখ সুখের পালার মধ্যে রাজ বড় হন।
মা-মরা ছেলেকে মাসি দেখভাল করেন, পরে বাবা মানুষ করেন। বাবা
করিমগঞ্জে ওকালতি করতেন,

‘করিমগঞ্জ নামে আছে সবডিবিসন।
তাহাতে উকিল তিনি পূর্ব হতে হন।।’

আবার দৃশ্য তৈরি হয়। পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের চাপে পিতা পুলিশ ইনসপেক্টর সীতানাথ চক্রবর্তীর মেয়েকে বিয়ে করেন, সন মাঘ ১২৮০/ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪-এ। বিমাতা স্নেহশীলা, পরিবার থিতু, পড়াশুনা শুরু হয়। শিশু রাজ ছোটকাকার সঙ্গে স্কুলে যায়, বর্ণপরিচয় পড়তে আরম্ভ করে। ‘বাড়িতে থাকিত মম ছোট খুল্লতাত/মাইনর স্কুল ছিল তথায় পড়িত/আমাকে আরঙিল সে স্কুলে নিতে/বর্ণপরিচয় আমি লাগিনু পড়িতে।’

সুখের সময়, রাজও মন দিয়ে পড়াশুনা করছেন, এন্ট্রান্স স্কুলের অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত এগিয়েছেন। যৌথপরিবারে আবার বিপর্যয়, বড় কাকার সঙ্গে বাবার মামলা শুরু হলো। রাজের মন্তব্য, ‘যেথায় উকিল বাবা মামলা তথায়/সকলি দেখিতে পাই বসিয়ে বাসায়।’ মামলা তীব্র হয়, পরিবার ভাঙে, বড় কাকা আলাদা হন, রাজও নবদ্বীপের টোলে পড়তে যান। এই পারিবারিক বিবাদের মধ্যেই রাজের বিয়ে হয় (১৮৮৭), তখন তাঁর বয়স ১৭ বছর। বিয়ের এক বছরের মধ্যে রাজের বাবা মারা যান, সংসারের দায়িত্ব এসে পড়ে রাজের উপর; পড়াশুনার পর্ব শেষ হয়ে যায়। রাজের স্মৃতিচারণে শুনি সে ‘আমি’র দুঃখ, ‘স্কুলের লেখাপড়া শেষ হয়ে গেল/সংসারের জ্বালা এসে আমাকে ঘেরিল/এতদিন গিয়েছিল পরম সুখেতে/বিয়ের ভার ক্রমে পরে গেল মাথে।’

সংসার জীবনে রাজ আদৌ বোকা ছিলেন না। প্রথমেই কাকার সঙ্গে পারিবারিক বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন, তার বর্ণনা তিনি বিস্তারিত দিয়েছেন। সেই বর্ণনা সংলাপপূর্ণ, যেন মান ভাঙার দৃশ্য। ১৮৯৩ সালে রাজের ছেলে হলো, পিতা রাজের চোখে ভবিষ্যৎ ধরা দিলো এইভাবে,

‘অত্যল্প বয়সকালে পাইয়া সুন্দর ছেলে
মনে হল আনন্দের উদয়।
সে আনন্দ নাহি ধরে বলিয়া বুঝাই কারে
যেন প্রেম সিঙ্কু উথলায়।
ষষ্ঠী পূজা অন্নপ্রাশন করিয়ে প্রফুল্ল মন
মনে ভাবি যদি বেঁচে থাকে।
লেখাপড়া শিখাইব উপযুক্ত বানাইব
জীবন যাইব মম সুখে।

আমি বৃদ্ধ না হইতে যুবক হইয়া সুতে
 যত্ন করে করিব পালন।
 যদি হয় সুকুমার করিবে বংশ উদ্ধার
 আমি হতে না হবে এমন।’

সাধারণ বাঙালি গৃহস্থের স্বপ্ন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের সময় থেকে চলে আসছে, সেই ভাবেই পুষ্ট হচ্ছে। সহৃদয় আত্মীয়ের সুপারিশে রাজ চাকরিও পান, হাফল্ডে, রেলওয়ে কোম্পানির স্টোরকিপার। পুত্রের চার বছর বয়সে হঠাৎ রাজের স্ত্রী মারা যান। রাজ ছেলেকে কাছে আনেন, নিজের উদ্যোগে ছেলে মানুষ করতে লাগেন। স্মৃতিটুকু অল্লান, হাতে খড়ি হবার পর,

‘ক্রমশ পড়াই তারে পড়ে অতি যত্ন করে
 প্রথম ভাগ বৎসরে সারিলা।
 দ্বিতীয় তৃতীয় পাঠ ক্রমান্বয়ে নয় পাঠ
 ফার্স্ট বুক আরম্ভ করিলা।
 অর্ধেক পড়িয়া পড়ে সাড়ে আট বৎসরে
 হঠাৎ সে পুত্র মারা গেল।’

নির্মম বিপর্যয়, নিছক তথ্য পরিবেশনের ভঙ্গিতে বলা। শোকে দুঃখে রাজ বিবাগী হলেন, তীর্থে তীর্থে ঘুরতে লাগলেন, ‘কষ্ট অপার’। এই অপার কষ্টের বিশদ বিবরণ আর রাজ দিতে চাননি, সাংসারিক পুবাশ্রমের কাহিনি শুকনো একটা তথ্যপঞ্জিতে শেষ করেছেন, ‘সেসব লিখিতে গেলে গ্রন্থ বড় হবে/ সংক্ষেপে লিখে এই সত্য শুদ্ধ ভাবে’। সেটা কীরকম? ‘বহুদিন বহুদেশ করিয়া ভ্রমণ/ ১৩১৩ (১৯০৬) সালে নদীয়া গমন।’ ‘নদীয়াতে যেতে,/ কৃষ্ণদাসে পাই পথে,/ সুবলপুর গ্রামে প্রবেশিয়া,/ সুধাই শান্তির কথা,/ বল শান্তি পাব কোথা?/ বলে পাবে শান্তি ইচ্ছাপুরে গিয়ে।’

এই ইচ্ছাপুরেই রাজের সঙ্গে বিবাহিতা রাজ্যেশ্বর বা রাজ্যেশ্বরীর দেখা হয়, উভয়ের মধ্যে প্রেম উথলে ওঠে। গ্রামসমাজ আলোড়িত হয়, কয়েকজন ভক্ত অনুরাগীর সাহায্যে রাজ রাজ্যেশ্বরকে নিয়ে পালান, ১৯১২ সালের মাঘ মাসে। ‘প্রেমানন্দে ভাসি তখন মিশিয়া দুজনে।’ এই প্রেমোন্মাদ জুড়ি মেদিনীপুর বাঁকুড়ার নানা জায়গা ঘুরে শেষ পর্যন্ত ‘জলসাগর’ (বানানো নাম) বলে একটা গ্রামে আস্তানা গাড়েন। উমেশচন্দ্র বিশ্বাস তাঁদের লাখেরাজ জমি দেন।

গুরু-গুরী তাঁদের আখড়া স্থাপন করেন, তাঁদের শিষ্য-শিষ্যারা নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকে। আত্মজীবনী শেষ হয় একটু বেপরোয়া সুরে,

‘অরণ্যে বসতি সম বসতি আমার
আপন মনে আপনি থাকি কি ধারি কার ধার।
এই দেশ ওদেশ ভ্রমণ করি আনি নিই খাই
এ রূপেতে জলসাঘর আশ্রমে কাটাই।’

স্মৃতিচারণ তো উজান বাওয়া, দেহসাধনার ভাষায় ‘উজু বাট’। ওই উজান বাইবার টানে সময়ের কোন অংশ ধরা পড়বে, এখনকার আমি তখনকার আমিকে কতটুকু দেখাতে চাইব, দেখাতে পারব, তা নির্ভর করে বিষয়ীর ইচ্ছার উপর। গুরু বর্তমানপন্থী রাজ খেপার ভাবনায় সংসারাত্মকটি সাধারণ শিক্ষিত চাকুরিজীবী গৃহস্থের জীবন। সেই জীবনের অভিজ্ঞতায় বিশেষ চমক নেই, একেবারে গতানুগতিক। পারিবারিক বিরোধ, জীবনে ঐহিক সাফল্যের জন্য শিক্ষাচর্চা, বংশ ও কুলরক্ষা, পরিবার চিন্তা—এই সবই রাজ খেপার সংসার স্মৃতিতে বারবার ফিরে এসেছে। কোনো আধ্যাত্মিক চিন্তার উদ্বোধন সেই জীবনে নেই, কোনো ভবিষ্যৎ দিব্য জীবনের আভাস নেই। লৌকিক সুখ-দুঃখের পালায় সেই জীবনটি বিধৃত। আত্মস্তিক পুত্রশোকই রাজ খেপাকে বৈরাগী করে, তীর্থভ্রমণ কিন্তু তাঁকে শান্তি দেয়নি। রাজ খেপার উত্তরণ হয়েছে মানবিক প্রেমে, যে উন্মাদনার কথা তিনি শেষ তিন পাতায় বলেছেন।

ফলে রাজ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন অভিজ্ঞতার ভূমিতে। পূর্বাশ্রমের প্রতিটি অভিজ্ঞতা সাধারণ ও দৈনন্দিনে আবদ্ধ। শৈশবে মাতার মৃত্যু, পারিবারিক ও জ্ঞাতি বিবাদ বা পিতার মৃত্যুতে সংসার প্রতিপালন—সবই বাস্তবসম্মত অভিজ্ঞতা, পূর্বাশ্রমের পটে কালিক নির্দেশে ঘটনা পরম্পরায় বলা হয়েছে। অন্যপক্ষে বিমাতার স্নেহ, বিবাহ, পুত্রের জন্ম, বাৎসল্যের উচ্ছ্বাস, চাকুরি-প্রাপ্তি—এইগুলিও সময়মাত্রিক উল্লিখিত হয়েছে। স্বভাবসঙ্গত ও স্বাভাবিক, সাধারণ জীবের অতীত এইরকমই, পূর্বাশ্রমের ধাঁচে সব জীবকেই বা ব্যক্তিকেই এই দায় বা দুঃখবোধের মধ্যে যেতে হবে, এটাই যেন রাজ খেপার পটকথার মর্ম।

অন্যপক্ষে এই পূর্বাশ্রম তো ভূত, অতীতকে তো আনা হচ্ছে কোনো না কোনো বর্তমানের অনুযুগে। সেই টানটা উত্তরণের। এই উত্তরণের টানটাও

অভিজ্ঞতা-সম্মত, সেই অভিজ্ঞতা সমাজ বহির্ভূত ও নিন্দিত প্রেমের। এই প্রেমের বিস্তৃত বর্ণনা রাজ দেননি, দেওয়াটা বোধহয় উদ্দেশ্যও ছিল না। প্রেমের অভিজ্ঞতাটাই তাঁকে বিশিষ্ট ও একক করেছে, তিনি ভরসা ও শান্তি পেয়েছেন, নিজস্ব সাধকসমাজও তৈরি করেছেন। রাজের অতীত অভিজ্ঞতায় এমন কিছুই নেই যাতে বলা যেতে পারে তিনি 'রাজ খেপা'য় পরিণত হবেন। রাজ্যেশ্বরের সঙ্গে প্রেমের পরশপাথরই তাঁকে উত্তরিত করেছে।

এই দিক থেকে খেপার আত্মজীবনী অভিজ্ঞতার দলিল, দৈনন্দিনতা থেকে আকস্মিকতায় উত্তরণের কাহিনি। এই উত্তরণ ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রামজীবনেও ঘটা সম্ভব, এটা অবশ্য আমরা বুঝি। রাজ তাঁর অহং-এর বিবর্তনকে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার স্তরেই লিখেছেন। তাঁর দৃষ্টি পরিবার, কুল ও পারিপার্শ্বিক সমাজবৃত্তের বাইরে প্রসারিত হয়নি। অহং-এর যাত্রা ও বিবর্তনে অভিজ্ঞতার পরম্পরার কার্যকারণকে সেভাবেই বলা হয়েছে। অথচ এই পরম্পরাটা যে লিখে ফেলা দরকার, সেটাও তো 'বাউলগুরু' রাজ খেপার পক্ষে ব্যতিক্রমী কাজ। আমিকে বোঝার ও বোঝানোর তীব্রতাই কী তাঁকে এই দৈনন্দিনতার বিবরণ লিখতে প্রণোদিত করেছিল? প্রশ্নটা থেকে যায়, উত্তর মেলে না।

মহাজন-প্রণাম

স্রোতা দত্ত

বাংলাদেশ ও পূর্ব ভারতের একটা বড় অংশ জুড়ে বহু সাধক বাউল এবং ফকির শিল্পী এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের সাধনাকে। প্রতি বছর বাউল ফকির উৎসব কমিটি তাদের মধ্যে এক বা একাধিক শিল্পী ও সাধককে সম্বর্ধনা জানায়।

সনাতন দাস বাউল

বর্তমানে বাঁকুড়ার বাসিন্দা সনাতন দাস বাউলের জন্ম খুলনা জেলার লকপুর গ্রামে, এক বৈষ্ণব পরিবারে। গানের প্রাথমিক পাঠ ঠাকুরদার কাছে। দেশভাগের বছর কয়েক আগেই মা-বাবা এবং ভাইয়ের সঙ্গে সনাতন দাস চলে আসেন এই বঙ্গে। ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে বহু সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের কাছে শিক্ষা নিয়েছেন, সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন পদ সংগ্রহ করেছেন। তা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে লিখেছেন বইও। বাউল সাধনাকে আপন করে পাঁচজন মন্ত্রগুরুর কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। আজীবন মাধুকরী বৃত্তিধারী সাধক সনাতন দাস বাউল কীর্তন এবং বুমুরের মুচ্ছনা মিশিয়ে তাঁর বাউল গায়নের রীতিকে করে তুলেছেন আরও সমৃদ্ধ। সেই সঙ্গে তাঁর নৃত্য-বিভঙ্গ ও দেশি-বিদেশি রসিকদের করেছে মোহিত। ২০০৬ সালে, বাউল ফকির উৎসবের প্রথম বছর তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

বিশ্বনাথ দাস বাউল

বীরভূমের জয়দেবের কাছে কোটা গ্রামে এক বৈষ্ণব পরিবারে বিশ্বনাথ দাস বাউলের জন্ম। বাবা পঞ্চানন ঠাকুর এবং মা যোগমায়া দেবী দু'জনেই ছিলেন সাধন-ভজনে ব্রতী। ঠাকুমা-ঠাকুরদাও ছিলেন একই পথের পথিক। এই পরিবেশে বড় হওয়ায় ছোটবেলা থেকেই বাউল গানের প্রতি তাঁর সহজাত আকর্ষণ তৈরি হয়। গানে হাতেখড়ি মায়ের কাছে। দীক্ষাগুরু খ্যাপা মনোহর ঠাকুর। শিক্ষাগুরু ত্রিভঙ্গ খ্যাপা। ছোটবেলা থেকেই ঠাকুমার সঙ্গে বিভিন্ন মেলায় ঘুরে ঘুরে সাধু-গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ করেন, সেই সঙ্গে শুরু করেন মাধুকরীও। সুন্দর চেহারা এবং অপূর্ব গায়ন ভঙ্গির জন্য খুব সহজেই বাংলা চলচ্চিত্র জগতে অভিনয় ও গানের সুযোগ ঘটে তাঁর। সেই সময়েই যোগাযোগের সুবিধার জন্য

ভিটে ছেড়ে বোলপুরে বসবাস করেন। কিন্তু চলচ্চিত্র জগতে তাঁর মন টেকেনি। সব আকর্ষণ ছেড়ে তিনি মনোযোগ দেন সাধনায়। এই সাধনাই তাঁকে পৌছে দেয় আন্তর্জাতিক দরবারে। ২০০৭ সালে, বাউল ফকির উৎসবের দ্বিতীয় বছরে তাকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সুবল গোসাঁই

২০০৮-এ, উৎসবের তৃতীয় বছরে সম্বর্ধনা জানানো হয় সুবল গোসাঁইকে। জন্ম ঢাকার মানিকগঞ্জ জেলায়। গানে হাতেখড়ি বাবা গদাধর বাউলের কাছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে হারিয়েছিলেন মা-বাবাকে। গান শিখেছেন প্রবাদ-প্রতিম ভবা পাগলা এবং সনাতন দাস বাউলের কাছে। বাঁকুড়ার নবাসনে হরিপদ গোসাঁইয়ের কাছে সহজিয়া মতে দীক্ষাগ্রহণ করেন সুবল গোসাঁই। নদীয়ার আড়ংঘাটার আশ্রমে বাস করলেও বুকে ধরে রেখেছিলেন ওপার বাংলার সুর। বাউল গানকে বিশ্বের দরবারে জনপ্রিয় করার অন্যতম কারিগর সুবল গোসাঁই। ইওরোপ, আমেরিকায় শ্রোতাদের মাতিয়েছেন। আজীবন যোগাযোগ ছিল বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহীদের সঙ্গেও। এপার বাংলার বাউলদের কাছ থেকে গান সংগ্রহ করলেও তাঁর গায়কিতে ছিল ‘পুবালী সুর’। সেটাই তাঁর গায়কীকে করেছিল অসাধারণ। ২০১২ সালে তাঁর প্রয়াণ ঘটে।

গৌর ক্ষ্যাপা

বাউল ফকির উৎসব কমিটি ২০০৯ সালে, উৎসবের চতুর্থ বছরে সম্বর্ধিত করে গৌর ক্ষ্যাপাকে। তাঁর জন্ম বীরভূমের ভালকুঠি গ্রামে। খুব ছোটবেলাতেই গানে হাতেখড়ি বাবা মাধব খেপার কাছে। অকালে মা-বাবাকে হারিয়ে ঘুরে বেড়াতে নানা জায়গায়। কিন্তু গান ছাড়েননি। গান শিখেছেন চিত্তামণি দাসী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দিকপাল বাউলের কাছে। সুবল গোসাঁই তাকে হরিপদ গোসাঁইয়ের কাছে নিয়ে যান ও গৌর তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তবে সুবল গোসাঁইকে গুরু মেনে আজীবন তাঁকে ‘বাবা’ সম্বোধন করেছেন গৌর। তাঁর জীবন যাপন তাঁকে এনে দিয়েছে ‘ক্ষ্যাপা’ তকমা। তাঁর গায়কীতে মুগ্ধ করেছিলেন বিদেশী শ্রোতাদের। এ দেশেও তাঁর গুণমুগ্ধের সংখ্যা কম নয়। যে কোনও বড় আসরে তাঁর অনন্য সাধারণ বাগ্মিতা মাতিয়ে রেখেছে রসিকদের। ২০১৩ সালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তাঁর।

বীরেন দাস গোসাঁই

জন্ম যশোহরের বিনাইদহে। মা সাবিত্রী দাসী, বাবা পুলিনবিহারী দাস। সাঁইজী শ্রী লালন শাহ ফকিরের সুরের আধার ফকির মকসেদ শাহ এবং খোদাবক্স শাহ তার সংগীতগুরু। এ ছাড়াও গান শিখেছেন বন্দিত বহু শিল্পী-সাধকের কাছে। বীরেন দাসের দীক্ষাগুরু ফকির ছাপদার শাহ ও শিক্ষাগুরু শ্রী নরোত্তম দাস। ফলে বাউল গানের ভাণ্ডার হওয়ার পাশাপাশি, বাউল এবং ফকিরি তত্ত্ব, দুটোতেই তাঁর পাণ্ডিত্য তাকে করে তুলেছে অনন্যসাধারণ। তার প্রভাব দেখা যায় তাঁর পাল্লা গানে। পরে সীমান্ত পেরিয়ে তিনি নদীয়ার চিলাখালিতে বসবাস শুরু করার পর থেকে বিভিন্ন প্রাচীন মেলা সংগঠনে ও আখড়া সংরক্ষণে বীরেন দাস গোসাঁইয়ের ভূমিকা অগ্রণী। গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে তিনি পরম তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিত। ২০১০ সালে, বাউল ফকির উৎসবের পঞ্চম বছরে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

চন্দ্রাবতী রায় বর্মণ

ওই বছর সম্বর্ধনা জানানো হয় বাংলাদেশের শিল্পী চন্দ্রাবতী রায় বর্মণকেও। সে বছর প্রথমবার ভারতে আসেন তিনি। প্রথম বারই তাঁর গান মন্ত্রমুগ্ধ করে শ্রোতাদের। শ্রীমতি বর্মণের জন্ম সিলেটের সুনামগঞ্জ এলাকায়। ছোটবেলা থেকেই গ্রামীণ আচার, ব্রত, বিয়ের গান ইত্যাদি শুনে বড় হয়েছেন। তাছাড়াও দিদিমা রাজ্যেশ্বরী বর্মণের কাছে শিখেছেন একান্তভাবে মেয়েদের গান ধামাইল। তেরো বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পর চর্চা বজায় থাকলেও সন্তান ও সংসারের চাপে সে ভাবে প্রকাশ্যে গান গাওয়া হয়নি সাময়িকভাবে। তবে উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। সংগ্রহ করেছেন রাধামরণ দত্ত, আবদুল করিম শাহ, হাসন রাজা প্রভৃতির গান। সব বাধা কাটিয়ে ১৯৬৯ সাল থেকে শ্রীমতি রায় বর্মণ বাংলাদেশের বেতারে গান গাইতে শুরু করেন। তাঁর বিচ্ছেদী ও মারফতি গান শ্রোতাদের মন জয় করেছে। ২০১৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

সুখমা দাস

২০১১ সালে, বাউল ফকির উৎসবের ষষ্ঠ বছরে সিলেটের আর এক শিল্পী সুখমা দাসকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাঁরও জন্ম সুনামগঞ্জ এলাকার পেরোয়া গ্রামে। বাবা রসিকলাল দাস ও মা দিব্যময়ী দাসী, দুজনেই গান বাঁধতেন এবং

গাইতেন। ছোটবেলা থেকেই গানের আবর্তে বড় হওয়ায় দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল হরি জাগরণের গান, গোপিনী কীর্তন, ঘাটু, ধামাইল ছাড়াও আরও অজস্র গান। বিয়ে হয় চকোয়া গ্রামে। পাঁচ সন্তানের মা সুখমা দেবী সংসার সামলেও গান গেয়েছেন বিভিন্ন ধর্মীয় ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিলেট শহরে আসার পর রাগপ্রধান গানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ছোট ভাই রামকানাই দাসের উদ্যোগে বেতার শিল্পী হিসেবে গান গাইতে শুরু করেন। রসিক মহলে তাঁর হরি গান, কবি গান, বাউল গান, আজও সমধিক জনপ্রিয়।

শ্রীমতী ফুলমালা দাসী

একই বছরে সম্বর্ধনা জানানো হয় বীরভূম জেলার আহমদপুর নিবাসী ফুলমালা দাসীকে। শুধু শহুরে শ্রোতা নয়, আন্তর্জাতিক শ্রোতা মহলে বাউল গানকে জনপ্রিয় করে তোলায় যে সব সাধকের অবদান অবিস্মরণীয়, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ফুলমালা দাসী। বাবা সুরিন দাস বাউল, মা সরলা দাসী। গানের হাতেখড়ি বাবা-মায়ের কাছে। দীক্ষাগুরু শ্রী রাধেশ্যাম গোস্বামী। শিক্ষাগুরু মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী ও ভারতী গুরু। এছাড়াও ফুলমালা দাসী তাঁর সাধনার পথে গুরু হিসেবে পেয়েছেন গোবিন্দ দাস গোস্বামীকে। পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশ এবং শহরে একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। তৈরি হয়েছে তার গানের অসংখ্য শ্রোতা। ২০১৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

খেজমত ফকির

ষষ্ঠ বছরে যে তিনজন সাধক-শিল্পীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। তাদের মধ্যে অন্যতম খেজমত ফকির। জন্ম এপার বঙ্গের নদীয়া জেলার ফাজিল নগরে। বাবা ফকির মহম্মদ খান, মা রঙ্গিলা বিবি। বাড়িতে সে অর্থে গানের চর্চা না থাকলেও ছোটবেলা থেকেই গ্রামের বিভিন্ন পরিসরে গান শুনে শুনে গানে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তের-চোদ্দ বছর বয়সে লেটো গান দিয়ে গান গাওয়া শুরু করলেও পঞ্চরসের গানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ফকিরি তত্ত্বের আকর্ষণে সতীমায়ের ঘরের ধারার অনুসারী কানাইনগরের ইমানি পণ্ডিতের সহচর ফকির কাদের মণ্ডলের কাছে আশ্রয় নেন। তিনিই খেজমত ফকিরের দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু। তাঁর গলায় লালনগীতি, যাদুবিন্দু, কুবীর গৌসাই, দুদু শাহের গান

শ্রোতামহলে জনপ্রিয়। একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণে আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তার গান সমাদৃত। তাঁর তত্ত্বের জ্ঞান গ্রাম বাংলার মানুষের কাছে খেজমত ফকিরকে করে তুলেছ বরণীয়।

২০১২ সালের সপ্তম বাউল ফকির উৎসবে সম্বর্ধনা জানানো হয় ওপার বাংলার সাধক শাহজাহান মুন্সি এবং কানাই দাস বাউলকে।

শাহজাহান মুন্সি

সেবারই প্রথমবার ভারতে আসেন শাহজাহান মুন্সি। ১৯৫৭ নাগাদ তাঁর জন্ম মানিকগঞ্জ জেলার ষাটঘর-তেওতা গ্রামে, পীর পরম্পরায় ঋদ্ধ এক পরিবারে। বাবার নাম আবদুল সামাদ মুন্সি, মা মোমেজা বেগম। চোদ্দ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে দৃষ্টিশক্তি হারালেও সংগীতের সাধনায় কোনওভাবেই ছেদ পড়েনি। বরং এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ ঘটে তাঁর গানে ও গায়নে। শাহজাহান মুন্সির দীক্ষাগুরু দানেজ মুন্সি এবং শিক্ষাগুরু সাবেদ আলী মুন্সি। দোতারা-সরোজ-সহ তাঁর গায়কীর অনন্য ভঙ্গীতে মেতেছেন রসিকজন। লালন গীতির পাশাপাশি, তাঁর গলায় রজ্জব আল দেওয়ান, আলাউদ্দীন, পাগলা বাচ্চুর মতো নবীন মরমী কবিদের গান ধরে রেখেছে বাংলা গানের ধারা। একাধিকবার বিদেশ ভ্রমণ করেছেন। তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড প্রকাশ পায় ১৯৯১ সালে ফ্রান্স থেকে। তত্ত্ব জ্ঞানের জন্য নবীন প্রজন্মের কাছে শাহজাহান মুন্সি এক গুরু এবং পীর।

কানাই দাস বাউল

জনমজুর বামাপদ মণ্ডল এবং মুলু দাসীর সন্তান কানাই দাস বাউলের জন্ম বীরভূমের তেঁতুলিয়া গ্রামে। বাড়িতে গানের পরিবেশ না থাকলেও ছোটবেলা থেকেই সহজাত ক্ষমতা জন্মান্ন কানাই দাসকে তত্ত্বগানে আকৃষ্ট করে। তাঁর দাদা তাঁকে জীবনভর গান গাইতে অনুপ্রেরণা দেন। এগারো-বারো বছর বয়সেই গান গেয়ে মাধুকরী বৃত্তি ধারণ করেন। তাঁর দীক্ষাগুরু কালাচাঁদ রায়। শিক্ষাগুরু জ্ঞানানন্দ বাউল। সাধনার পথে পেয়েছেন আরও বহু সাধু-গুরুর সংস্পর্শ। তাঁদের সঙ্গ ও দিকনির্দেশে তারাপীঠের মহাশ্মশানে বসবাস শুরু করেন। দেশী-বিদেশী বহু শিল্পী, লেখক, চলচ্চিত্রকারের সঙ্গেই স্বভাব মাধুর্যে তার যোগাযোগ অটুট। দেশে এবং বিদেশের বহু আসরে তাঁর অপূর্ব গায়ন রীতি

আকৃষ্ট করেছে শ্রোতাকে। তা সত্ত্বেও ভোলেননি শিকড়। আজও তারা পীঠের শ্মশানে গেলে কানে ভেসে আসে কানাই দাস বাউলের গলায় রামপ্রসাদী বা হাউড়ে গৌসাইয়ের গান।

তিনকড়ি চক্রবর্তী

২০১৩ সালে, অষ্টম বাউল ফকির উৎসবে তিনকড়ি চক্রবর্তীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। গান তো বটেই, ডুবকিতে তাঁর হাতের লহর রসিক মহলকে মুগ্ধ করেছে। তিনকড়ি চক্রবর্তীর জন্ম হুগলি জেলার সোমরা বাজারে। মা রামপ্রসাদী গান গাইতেন আর বাবা ভবাণী চক্রবর্তী ডুবকি বাজাতেন। অত্যন্ত শিশু বয়সে বাবার কাছে ডুবকি বাজানোয় হাতেখড়ি তাঁর। শুধু ডুবকিতে নয়, দোতারায় তার শিক্ষাগুরু মসলন্দপুরের নিমাই দাস। আর বাউল মন্ত্রে তাকে দীক্ষা দেন আড়ংঘাটার সুবল গৌসাই। এ ছাড়াও সারা জীবন ধরে বিভিন্ন সাধু গুরুর সঙ্গে আদান-প্রদান তাঁর বাজনাকে করে তুলেছে আরও ঋদ্ধ। তবে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জীবিকা হিসেবে কখনও ম্যাজিকের দলে কাজ করেছেন, কখনও ওষুধের ক্যানভাসিং, কখনও আবার হাটে-বাজারে কায়িক শ্রমের কাজ করতেও পিছপা হননি। এত সব সত্ত্বেও গানের জগত থেকে সরে থাকতে পারেননি কখনোই। ২০১৪ সালে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

মোসলেম ফকির

নবম বাউল ফকির উৎসবে সম্বর্ধনা জানানো হয় নদিয়ার চাপড়ার তরণীপুরের বাসিন্দা মোসলেম ফকিরকে। জন্ম অত্যন্ত স্বচ্ছল পরিবারে হলেও ছোটবেলা থেকেই গানের অমোঘ টানে ফকিরি তত্ত্ব ও সাধনায় ব্রতী হন। দীক্ষাগুরু হিসেবে পেয়েছেন দরবেশ ঘরের সাধক গিয়াসুদ্দিন বিশ্বাসকে। তাঁর গানের শিক্ষাগুরু ইয়াজুদ্দিন মল্লিক, হারিজুদ্দিন শেখ, অজিত পরামানিকের মতো প্রবাদপ্রতিম সাধক-শিল্পীরা। এ ছাড়াও দুই বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে গান সংগ্রহ করে মোসলেম ফকিরের গানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে। তারই প্রভাব দেখা যায় মোসলেম ফকিরের পাল্লা গানে। যদিও শহুরে শ্রোতাদের কাছে এই নাম বহুল পরিচিত নয়, কিন্তু নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ছাড়াও গ্রাম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে, বহু সাধক-শিল্পীর কাছেই আজীবন মাধুকরী বৃত্তিধারী মোসলেম ফকির শ্রদ্ধেয় এক মরমী সাধক বলেই পরিচিত।

২০১৫ সালে, বাউল ফকির উৎসবের দশম বছরে আব্দুল হালিম ফকির, মনসুর ফকির এবং রাধেশ্যাম দাস বাউলকে সম্বর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত হয়।

আব্দুল হালিম ফকির

বীরভূম জেলার রামপুরহাটের বগটুই গ্রামে ১৯৫৯ সালে আব্দুল হালিম ফকিরের জন্ম হয়। বাবা আনসার আলি, মা জানেচ্ছা বিবি। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে ডুবকি বাজিয়ে ফকিরি গান গাইতে শুনেছেন। সংগীত জগতে হাতেখড়িও বাবার হাতে। দীক্ষাগুরু হিসেবে তারাপীঠের জব্বর চিস্তির আশীর্বাদধন্য হালিম ফকির। বাঁয়া, একতারা নিয়ে গান গাইতে শিখলেও দোতারা শিক্ষায় গুরু হিসেবে পেয়েছেন শহরত আলি বিশ্বাসকে। তাঁর শিক্ষাগুরু বাংলাদেশের হজরত খাজা মনসুর আল চিস্তি। রুজির টানে বার-তেরো বছর বয়সেই ট্রেনে গান গেয়েছেন। আবার বেলুড়ের লালবাবার আশ্রমে টানা আড়াই বছর কাটিয়ে গান গেয়েছেন। কিন্তু কোনো কিছুই তাঁর সাধনার পথে অন্তরায় হয়নি। দোতারায় তাঁর শৈল্পিক দক্ষতার পাশাপাশি হালিম ফকিরের গলায় জব্বর চিস্তি এবং মনসুর আল চিস্তির বিরল সংগ্রহ শোনার অভিজ্ঞতা বাংলা গানের সম্পদকে করে তোলে আরো ঐশ্বর্যমণ্ডিত।

মনসুর ফকির

জন্ম নদীয়া জেলার থানার পাড়া এলাকার গোড়ভাঙা গ্রামে। মা মোহবা বেওয়া। বাবা আজাহার ফকির। মা বিয়ের গানের সঙ্গে নাচে পারঙ্গম ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই বাবাকে একতারা ও ডুগি বাজিয়ে ফকিরি গান গাইতে দেখেছেন। এই আবহে খুব কম বয়সেই গান শুরু করেন মনসুর ফকির। গানে হাতেখড়ি বাবার কাছে। পাশাপাশি শিখেছেন জুড়ি, করতাল, খোল, খমক, ডুবকি দোতারার মতো একাধিক বাদ্যযন্ত্র। তার শিক্ষাগুরু ইলাহি বক্স। দীক্ষাগুরু ইমান পণ্ডিত। সারা জীবন ধরে দুই বাংলার বেহাল শাহ, করিম শাহ, মকবুল শাহ, ননীবালা, আজাহার ফকির, সোলেমান ফকিরের মতো বিভিন্ন সাধক-শিল্পীর সঙ্গে তাঁর সাধনাকে করে তুলেছ আরো গভীর। ঝাড়ু কোলের কাছে দোতারা শিক্ষা মনসুর ফকিরের গানের বিস্তারকে দিয়েছে অন্য মাত্রা। বিশেষত দোতারা সহযোগে তাঁর ফকিরি গান গ্রাম-শহরের রসিককে উদ্বেল করে তোলে।

রাধেশ্যাম দাস বাউল

প্রখ্যাত তবলাবাদক শ্রী তারাপদ দাস এবং শ্রীমতি শেফালি দাসের সন্তান রাধেশ্যাম দাসের জন্ম বীরভূম জেলার বশুইপাড়া গ্রামে। মাত্র ছয়বছর বয়সে বাবার হাত ধরে গানের জগতে প্রবেশ। তার শিক্ষাগুরু নন্দদুলাল ব্রহ্মচারী। শিক্ষাগুরু ভবতারণ গোস্বামী। এ ছাড়াও গুরু হিসেবে পেয়েছেন মনচোরা দাস, শশাঙ্ক গোসাঁই, জগন্নাথ মাঝিকে। তবে দিন গুজরানের জন্য বহু বছর ধরে শ্রমিক হিসেবে কখনো মাঠে কখনো বা অন্যান্য কাজও করেছেন। কিন্তু গান ও সাধনা ছাড়েননি। শুধু গান নয়, একতারা, বাঁয়া, শ্রীখোল, খমক, তবলা, দোতারা, হারমোনিয়ামে রাধেশ্যাম দাসের দক্ষতা প্রশ্নাতীত। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে তাঁর গলায় হাউড়ে গোসাঁই, কুবীর গোসাঁই, যাদুবিন্দু, ক্ষিতীশ গোসাঁই, রসিক সরকার, বিজয় সরকারের বিরল সংগ্রহ রসিক শ্রোতাদের কাছে এক অনন্য অভিজ্ঞতা।

With Best Compliments



BERGER PAINTS INDIA LIMITED

Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700 017
Phone : 2229 9724-28, 2229 6005-06 Fax : 91-33-2249 9009 / 9729
www.bergerpaints.com

Congratulations!

from

www.baularchive.com